ভারতরত্ন, সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত ব্যাস
কর্ত্তৃক ভারতের নানাস্থানে প্রদত্ত বর্ক্তৃতার সারাংশ
ও পুস্তকাকারে মুদ্রিত মূর্ত্তিপূজানামক হিন্দী-
বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রু কলয়া শুদ্ধেদ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥"

পণ্ডিত শ্রীশীতল শর্ম্মা-কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৬।

এ পুস্তকের লম্বা চৌড়া মুখবন্ধ অনাবশ্যক। এই টুকু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ বক্তা সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'মূর্ত্তিপূজা' নামক হিন্দী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। এই বক্তৃতা হিন্দী ভাষায় পুস্তকাকারে অনেক দিন যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া এবং কিয়ৎপরিমাণে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া এবার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। শিক্ষার ফেরে, সংসর্গের দোষে এবং কালমাহাত্ম্যে দিন দিনই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি হিন্দু-সন্তানগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা বিচলিত হইতেছে। ভারতে অধর্ম্ম, অনাচার, ও স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত কিছুদিন হইল প্রবল বেগে বহিতেছিল; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যাসজীর ন্যায় সুবক্তা ও সুপণ্ডিত ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধন করিয়াছেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে বহুনগরে সহস্র সহস্র শ্রোতা শ্রীযুক্ত ব্যাসজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিবার অবসর ও সুবিধা পাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া পাশ্চাত্য জড় শিক্ষার ভ্রান্ত ও অসার মতে ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন। দয়ানন্দ মতাবলম্বী অনেকে এই বক্তৃতা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, এবং অদ্যাপি কোনও বিপক্ষ যুক্তিবলে এই বক্তৃতার খণ্ডন করিতে সমর্থ বা সাহসী হন নাই।

যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে পণ্ডিতজীর বক্তৃতারস আস্বাদন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কৌতুহল নিবারণার্থ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া 'মূর্ত্তিপূজা' হিন্দীপ্রবন্ধ হিন্দীপাঠকগণের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। সেই পুস্তকেরই বঙ্গানুবাদ স্বধর্ম্মপরায়ণ, সুচরিত, বঙ্গদেশবাসী হিন্দুসন্তানগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। অবিশ্বাস ও সন্দেহে ভ্রমান্ধ হিন্দুসন্তানগণ যদি এত দ্বারা কিছুমাত্রও পৈতৃক ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন, ইহা পড়িয়া যদি কোনও স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণেও দৃঢ়তর হয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকগণ মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে এ পুস্তক হইতে যদি বিন্দু মাত্রও সাহায্য প্রাপ্ত হন; তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। সহৃদয়

কগণ এ গ্রন্থের আদর করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে শ্রীযুক্ত ব্যাস-
"জাতিভেদ" ও 'অবতার মীমাংসা' নামক বক্তৃতারও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ
তে চেষ্টা করিব। আজ কাল মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে যেমন সন্দেহ ও অবি-
নর ঢেউ চলিয়াছে, 'জাতিভেদ' লইয়াও তেমনি লণ্ডভণ্ড স্বেচ্ছাচারিতা
া দিয়াছে। পণ্ডিতবর অম্বিকাদত্ত ব্যাসজীর "জাতিভেদ" বক্তৃতা
য়া শত শত শ্রোতা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাহাও
ক্ষরে প্রকাশ করিতে একান্ত বাসনা আছে। শ্রীশ্রীহরির কৃপা ভরসা।
অনুবাদ পাঠোপযোগী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি
নও রূপ ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা
রবেন। ইতি।

বিনীত নিবেদক
প্রকাশক
শ্রীশীতল শর্ম্মা।

ই বৈশাখ, ১৩০৪ সাল।

# সূচীপত্র।

# মূর্ত্তিপূজা।

(পণ্ডিতপ্রবর ভারতরত্ন শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের এই বক্তৃতা সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট, মধ্য-প্রদেশ, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, বিহার ও বঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রদেশের বহুস্থানে সহস্র সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রবণে পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা কলুষিত চিত্ত শতশত হিন্দু সন্তানগণের মতি গতি ফিরিয়াছে এবং সনাতন ধর্ম্মে আস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)।

ভদ্র মহোদয়গণ,

অকস্মাৎ এমনি এক যুগ আসিয়াছে, যে প্রতিমাপূজার প্রতি লোকের গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিতেছে। কোথা হইতে এক বাবু সাহেব আসিলেন আর মূর্ত্তিপূজার উপর ঝাল ঝাড়িতে বসিলেন। আবার কোথাকার কে এক সন্ন্যাসী বাবাজী আসিলেন, তিনিও মূর্ত্তি পূজার উপর হাত নাড়িতে লাগিলেন। এদিকে দেখুন, নব্য শিক্ষিত ইংরেজীনবিস দিগের পড়িবার এবং পড়াইবার প্রণালী এমনই নষ্ট ভ্রষ্ট যে, সনাতন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা উঁহাদের হৃদয় হইতে স্বয়ংই উড়িয়া যায়। এমন কেনই বা না হবে? আমাদের বাবু লোকেরা ছেলেদিগকে আশৈশব নমস্কার প্রণামের স্থলে গুড্‌মর্ণিং (Good morning) শিখাইতে আরম্ভ করেন এবং কিছু বড় হইলেই স্কুলে নিয়ে মাষ্টারদের হাতে কৃষ্ণার্পণ করিতে থাকেন, ইহাতে আর হবে কি? যে বালক পিরাণের বোতাম আটকাইতে পারে না, পায়খানা ফিরিয়া জলশৌচ করিতে জানে না, এমন শিশুর বিশুদ্ধ দুগ্ধফেননিভ কোমল হৃদয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিকৃত ভাবের বীজ উপ্ত হইতে থাকে। বাড়ী হইতে চুষিকাটী কি বিস্কিট্ লজঞ্জুস্ চাটিতে চাটিতে স্কুলে পৌছিল এবং দেখিতে দেখিতে পেন্সিল চাটা প্রথম পাঠ (first

lesson) শিক্ষা করিল। এখন চাই হিন্দুর ছেলে মুসলমান বালকের পেন্সিল লউক, অথবা ব্রাহ্মণ কায়স্থের বালক ধোপানন্দনের পেন্সিল লউক, চাটিবার সময় কি কিছু বাদ বিচার করিয়া থাকে? এর পর "ইয়েস্ সার্," "নো সার্" বুলি শিখিতে শিখিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। আপন আপন ধর্ম্মের বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারে না। হাঁ, তবে এটুকু উন্নতি অবশ্যই হইয়াছে যে, আগে একখানা লেপাপা বন্ধ করিতে গঁদদানী কি জল খুঁজিতে হইত, এখন চট্ ক'রে ঠোঁট হ'তে থুথু লাগাইয়াই বন্ধ করে। বিদ্যার দৌড়ে চাকর ডাকা ও জল খোঁজার দায় বাঁচা গিয়াছে। আগে হাতের আঙ্গুল কিছু কর্কশ ছিল, এখন এত কোমল ও মিহি হইয়া গিয়াছে যে,বইয়ের পাতা উল্টাইতে কোটি কোটি যত্ন করিয়াও আঙ্গুল ফস্কিয়া যায়, পরে কি করে. বেচারাদের হেরে গিয়ে থুথু আর কফের জোরে পাতা উল্টাইতে হয়!! দেখুন ত করুণাময় বিধাতা এই শরীরের ভিতরেই গঁদ আর জলপাত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু অল্পবুদ্ধি সাবেকী লোকেরা তাহা দেখিতে পারে নাই। আজকাল বিশাল বুদ্ধি নব্য শিক্ষিতেরা ইংরাজি বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছে! এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সংস্কৃত চর্চ্চা মোটেই করে না—করিলেও শুদ্ধ করিয়া অনুস্বার বিসর্গ বসাইবার সাধ্য হয় না। আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহাদের শ্বেত কৃষ্ণ কোন জ্ঞান জন্মে না—জন্মিলেও এইটুকু মাত্র হয় যে, মধ্য-এসিয়া নিবাসী আর্য্যজাতি নানা সময়ে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। উহাদের এক অংশ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের সন্ততিই আমরা সকলে। সংস্কৃত ভাষা উহাদের ভাষা হইতেই উদ্ভূত এবং উহাদের মত হইতেই সনাতন ধর্ম্মের সৃষ্টি। উহাদের বংশাবতংশ ধুরন্ধর আমরা সকলে, যাহাদের অতল স্পর্শ গভীর বুদ্ধি সাগরে একথার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে যে, ভারতবর্ষও আমাদের নহে, আমরাও ভারতবর্ষের নহি। পরন্তু যে সকল জাতিকে ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি, তাহারাই আমাদের ভাই বন্ধু ও বংশ প্রবর্ত্তক!! এই সকল বালকদের শ্রাদ্ধ তর্পণ, তীর্থযাত্রা ও প্রতিমা পূজার প্রতি সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা জন্মিলে সে কি বড় আশ্চর্য্যের কথা? এ বিষয়ে এই শিশুদিগের কি কোন দোষ আছে? সত্য বলিতে কি, যত অনর্থের কারণ আমরাই। যে বালকদিগকে স্বধর্ম্ম পুস্তক প্রথমে অভ্যাস

করান কর্ত্তব্য, তাহারা যদি কভু কোথায়ও সনাতন ধর্ম্মের সভা সমিতি, সৎপ্রসঙ্গী বা সৎসঙ্গ প্রভৃতিতে যোগদান করিল ত আমরা বলি "এখানে ছেলে পুলের কি কাজ? এ সব ত বুড়োদের জন্য।" পক্ষান্তরে কোথায়ও মজাদার বাই খেমটা নাচ হইলে খোকা বাবুদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে সকলের সম্মুখে বসাইয়া দেই এবং "কামিনী কটাক্ষে" অভিজ্ঞ করাইতে থাকি। এখন বলুন ত, প্রিয় মহাশয়গণ, এ বিষয়ে সর্ব্বথা দোষ আমাদের কি ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের? আর আজকাল মূর্ত্তিপূজার প্রতি লোকের যে অশ্রদ্ধা ও বিষম সন্দেহ জন্মিতেছে, এই তাহার কারণ।

কোন ধর্ম্ম বিশেষের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কেননা সনাতন ধর্ম্মের স্বভাবই এরূপ নহে যে, অপর কাহারও কাছে ধন জন প্রার্থনা করিবে; অথবা দর্প করিয়া ঘোষণা করিবে যে ২৫ কোটি হিন্দু ব্যতীত সংসারের যত লোক সকলেই নরকযাত্রী। হিন্দুধর্ম্ম স্পষ্ট বলিতেছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। ইহা হইতে আমিত এই বুঝি যে মুসলমান আপন ধর্ম্মত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পাপী হইবে, ঈশাধর্ম্মাবলম্বীও আপনধর্ম্ম ত্যাগ পরিয়া পারসী হইলে পাতকী হইবে। আমার কি দায় পড়িয়াছে যে, উঁহাদের মত খণ্ডন করিব? ইহার রুচিবিকারটা আমাদের দুইচারি হাজার শ্রীবিশিষ্ট দয়ানন্দজীরই ছিল, যিনি আপন মত দেড় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু জগৎসংসারের মত খণ্ডন মুণ্ডন (অহংচ ত্বং চ) করিতে করিতে তাঁহার সত্যার্থ প্রকাশেরও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন! এবং সকল মতের ঐক্য সাধন করিতে যাইয়া সকলের সহিতই ঝগড়া লড়াই বাধাইয়া দিয়াছেন!

বেশ, এখন দেখা যাউক, মূর্ত্তিপূজার প্রতি আধুনিক নব্য শিক্ষিতদের কত প্রকার সন্দেহ হইয়াছে। পরে প্রত্যেকটী পৃথক পৃথক আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, এবিষয়ে আর কোন সন্দেহজনক কথা বাকী রহিল কিনা? যেমন আদালতে ভিন্ন ভিন্ন ইস্যু ধার্য্য হইয়া গেলে মকর্দ্দমা সর্ব্বাঙ্গীন নিঃসন্দেহ হইয়া যায়, সেইরূপ আজ আপনারা এই বিপুল সন্দেহ সাগরবৎ বিষয়ের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন এবং সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া লউন।

আজ কাল মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে প্রায় এই সকল সন্দেহ মূলক প্রশ্ন শুনা যায়, যথা :—

১। একের পূজাদ্বারা অন্যের পরিতোষ কিরূপে?

২। নিরাকার ব্রহ্মের আকারকল্পনা কিরূপে সম্ভব?

৩। ব্যাপকতা বোধে মূর্ত্তিপূজা করা হইলে কোনও বিশেষ বিশেষ পদার্থের পূজা কেন করা হয়?

৪। নিরাকারের উপাসনা ধ্যানাদিদ্বারা সম্ভব হইলে মূর্ত্তির প্রয়োজন কি?

৫। মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ভারতের এতদূর অধোগতি হইয়াছে—কোনও লাভ নাই—অতএব তাহা আর কেন?

৬। সম্প্রদায় ভেদ কি নিমিত্ত?

৭। বেদ বিরুদ্ধ আচরণ কেন?

৮। প্রমাণ কি?

আমার বুদ্ধিগোচরে এই কয়েক প্রকার প্রশ্নই উদিত হইতেছে এবং ইহাদেরই সম্যক্ আলোচনা ও বিচারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছি। পরন্তু যদি আপনাদের বিবেচনায় কোন প্রশ্নের উল্লেখ না হইয়া থাকে, ত বলুন তাহাও ধরিয়া লইতেছি। (না, না, ঠিক হয়েচে)

ভাল, এখন প্রথম প্রশ্ন হইতেছে—

(১) "একের পূজাদ্বারা অপরের পরিতোষ কিরূপে সম্ভবে।"

আপনারা স্থিরবুদ্ধি ও একাগ্র হইয়া দেখুন, এই প্রশ্ন কি প্রকার ভাব-ভঙ্গীতে পরিপূর্ণ। "একজনের পূজা করিলে তদ্দ্বারা অপরের সন্তোষ হইবে কিরূপে?" অর্থাৎ উঁহাদের মন এই প্রকার উদাহরণে পরিপূর্ণ যে, আমি কাণে আতর লাগাইলে তাহাতে আমার ঠানদিদির কি আনন্দ? হাঁ, তা ঠিক বটে, বাবু মহাশয়, কিন্তু তোমার প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন দোষ যদি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে আর সন্দেহ থাকিবে না।

(ক) এই প্রশ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্রশ্নকর্ত্তা জগৎকে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক মনে করিতেছেন; কিন্তু সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি কথনও একথা স্বীকার করিতে পারেন না। যদি আমরা একটী সামান্য কুন্দ কুসুমের সৌন্দর্য্যকলা অবলোকন করি, উহার ভিতরেই কেমন এক অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী দেখিতে পাই। শ্বেত-কৃষ্ণ-পীত চিত্র বিচিত্র শত শত প্রজাপতি উহাকে মণ্ডিত করিয়া রহিয়াছে, মকরন্দলোলুপ শত শত প্রমত্ত মধুকর

ঝঙ্কার শুনাইতে শুনাইতে উহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে। যে পথিক উহার সমীপ হইতে আসিতেছে, সেই সুগন্ধে বিমোহিত হইয়া অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইতেছে। যে দেখিয়াছে, তাহারই চক্ষু ধাঁধিয়াছে, যে ঘ্রাণ লইয়াছে, সেই ক্ষণেকের তরে আত্মহারা হইয়াছে। যে পাইয়াছে, সেই মাথার উপর, কাণের উপর আগ্রহে ধরিতেছে। এখন বলুন ত, পরমাত্মাব্যতীত মধুরতা ও মনোহরতা প্রভৃতি শক্তির আর কি কোনও ভাণ্ডার আছে—যেখান হইতে ফুলে এই সকল গুণ আসিতে পারে? পরমাত্মা ভিন্ন এমন কি কোন ও চমৎকারিত্বের মহাসাগর আছে—যাহা চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রদিগকে প্রকাশ করিয়াছে, বনস্পতি ও নানাজাতীয় বিহঙ্গদিগকে চিত্র বিচিত্র বর্ণ ও কল কূজিত দিয়াছে এবং এই বিশাল ধরণীকে ধারণশক্তি দিয়াছে? আরও যত রকমের শক্তি যদি অন্যান্য স্থান হইতেই আসিয়া থাকে, তবে সেই বেচারা সর্ব্বশক্তিমানের জন্য ত একটী শক্তিও থাকিবেনা। এমত অবস্থায় তাঁহার স্বীকারেই বা কি প্রয়োজন? না, তাহা কখনই নহে, কিছুতেই নহে। এই সকল সাংসারিক পদার্থে যতটুকু মনোহারিতা ও সৌন্দর্য্য আছে, তাহা সেই পরমাত্মার অনন্ত মনোহারিতা কলারূপে প্রতিফলিত ও উদ্ভাসিত মাত্র। যত শক্তি দেখিতে পান, উহা তাঁহারই শক্তি। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। বস্তুতঃ সমগ্র জগৎ তাঁহারই স্বরূপ। দেখুন বেদও এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যম্।" (যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সমস্তই পরমেশ্বর)। "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (যে সমস্তকে এক বুঝিতে পারে তাহার শোকই বা কি আর মোহ ই বা কি) "স আত্মানং স্বয়মকুরুত" (তিনি স্বয়ংই আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন)। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (এ সমস্তই ব্রহ্ম)। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" (ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়)। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (এখানে ভিন্ন ভিন্ন কিছুই নাই)। ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব জগৎ ও ব্রহ্ম পরস্পর পৃথক মনে করিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ এবং অমূলক। কেননা "সতি কুড্যে চিত্রম্" ভূমি হইলে উহাতে চিত্র আঁকিবে। কিন্তু যখন ভেদই সিদ্ধ নহে, তখন ভেদমূলক প্রশ্ন এবং সন্দেহও ঠিক হইতে পারে না।

এখন যদি বলেন, মহাশয়, দ্বৈতবাদের কি গতি হইবে? ইহার উত্তর এই—দ্বৈতবাদী মাধ্বাদিসম্প্রদায়ীরাও এই বলেন যে,সেবাবস্থায় অভেদ জ্ঞান

থাকিতে পারে না। অভেদজ্ঞান-সিদ্ধ থাকিলে সেবা হইতে পারে না। এনিমিত্ত সেবাবস্থায় ভেদ জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রায় এই রকমের কিছু কিছু গোস্বামী তুলসীদাসও কহিয়াছেন "ম্যাঁয় সেবক সুচরাচর রূপরাশি ভগবন্ত।" কিন্তু ইহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা মাত্র। যদি দার্শনিক সিদ্ধান্ত দেখেন, তবে পরম দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যের আরম্ভেই দেখিতে পাইবেন, বিজ্ঞানভিক্ষু স্পষ্টই সর্ব্বদর্শনের আদিঅন্ত পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলাবদ্ধ অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তে রাখিয়াছেন।

আমি, কিন্তু, পরমাত্মাকে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় বলিতেছি। অর্থাৎ পরমাত্মা এক অপূর্ব্ব পদার্থ। তিনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম, সাকার এবং নিরাকার, এক এবং অনেক, সগুণ এবং নির্গুণ, জীব হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন। ইহার তত্ত্ব কতক পরিমাণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আপনারা বুঝিতে পারিবেন।

(খ) এখন পুনরায় ঐ প্রশ্নের পরীক্ষা করিয়া দেখুন, উহাতে কতবড় এক ভুল রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে 'একের পূজায় অপরের সন্তোষ কিরূপে হইবে?" প্রশ্নকারকের তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় যে 'তোমরা যে, মৃৎপ্রস্তরের পূজা করিতেছ, ইহাতে সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইবেন কিরূপে?' 'কিন্তু, এ কেমন ভুল! আমরা মাটী পাথরের পূজা কখনই করি না; কিন্তু, প্রস্তর মৃত্তিকার আশ্রয়ে সেই সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষের পূজা করি। যে প্রিয়তম প্রাণপতির সহিত মিলিত হইতে আমার জন্ম জন্মান্তর হইতে বাসনা রহিয়াছে যিনিবিনা জগৎ আমার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; শুনিতেছি তিনি সর্ব্বব্যাপক। আমি হাত যুড়িয়া মাথা লুটাইয়া তাঁহাকে একবার প্রণাম করিতে চাই। কিন্তু, সেই সর্ব্বব্যাপককে প্রণাম করিতে আমার হাত এবং মাথা কখনও সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না। আমি যখন মাথা নোয়াইব, তাহা এক দিকেই ঝুকিবে, যখন হাত যুড়িব, তাহা এক দিকেই থাকিবে। এখন কি সত্য জানিয়া চুপ করিয়া থাকিব, না মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিব? চুপ করিয়া থাকিলে আমি নাস্তিকেরও বুড়ো দাদা হইলাম; ঈশ্বর মানাও যা না মানাও তাই। একবার মাথা নোয়াইলেই,যে সকল বিদ্যাদিগ্‌গজদিগের পেটে বুদ্ধি গজ গজ করিতেছে, তাঁহারা বলিয়া উঠিবেন, আপনি কি দিক্‌পূজক! আমি যদি, 'ঈশ্বরায় নমঃ; বলিত অমনি বলিবেন, আপনি কি ঈ—শ্ব—র এই অক্ষর পূজক? সত্য সত্যই আপনি কি এইরূপে কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন? কখনই

নহে। যেহেতু সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা ঈশ্বরের প্রতিনিধি শব্দের ভিতরে পড়ে না।

আমার মূর্ত্তিপূজার তাৎপর্য্য এই যে, কোন ও প্রতিনিধিদ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করা। সুতরাং আপনাতে আমাতে পার্থক্য এই যে, নাম ও রূপ দ্বিবিধ প্রতিনিধিত্বের আপনি নাম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন; আমি রূপ প্রতিনিধিও মানিতেছি এবং কোনও মূর্ত্তিকে ভগবানের প্রতিনিধি মানিয়া ঐ মূর্ত্তিদ্বারা তাঁহারই পূজা করিতেছি। পরন্তু, একের পূজাদ্বারা অন্যের প্রসাদন জন্মাইনা।

ইহাকেও যদি অন্যের পূজা দ্বারা অন্যের পরিতোষ বলেন তবে আপনারাও—অবশ্য যদি নাস্তিক না হন—এ কথার বাহিরে নহেন। যদি আপনি নিরাকারপরমাত্মা ( Impersonal God ) বাদী থিয়সফিষ্ট হন, (সকল থিয়সফিষ্ট এমন নহেন, কিন্তু বাছাইকরা আমাদের ঘরের দুলালের ন্যায় কেহ কেহ এরূপ আছেন), তাহা হইলে আজ্ঞাচক্রের প্রকাশকে এবং অনাহতনাদকে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতেছেন কেন? আপনি যদি ব্রাহ্ম হন, তবে তানপুরা, একতারা, সঙ্গীত, 'ব্রহ্ম' এই অক্ষর ও ধ্বজা-পতাকার বিভ্রাটে পড়িয়া আছেন কেন? অবশ্য, হয় আপনি ইহাদিগকে তাঁহাকে পাইবার সোপান মনে করিতেছেন, নতুবা তাঁহারই কোনও প্রকারের প্রতিনিধি মনে করিতেছেন। হইল এই যে, আমার কথা আপনিও মানিতেছেন। কিন্তু, এই মাত্র পার্থক্য যে, আমি কোন ও আচার্য্য প্রদর্শিত প্রণালী-শৃঙ্খলে আবদ্ধ—আপনি উচ্ছৃঙ্খল! যদি সকল যেয়ে থুয়ে আপনি সমাজী (আর্য্য সমাজ) দলভুক্ত হন, তবে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ে থাকিবেন না বটে, কিন্তু, তথাপি, তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ গায়ত্রী, বেদমন্ত্র, ও ঈশ্বরবাচক শব্দকে প্রতিনিধি স্বীকার করিতেছেন। স্বীকার না করিলে, আমাকে প্রশ্ন করিতেও কখনও প্রতিনিধি বাচক ঈশ্বরশব্দ আপনার মুখ হইতে নির্গত হইত না।

ভাল, মানিয়া লই, যদি কোন হতভাগ্য নাস্তিকই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে "বাবু, 'ঈশ্বর' শব্দ সম্বন্ধেই তোমার প্রশ্ন, না সেই পরম পুরুষ অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে"? যদি বল শব্দ সম্বন্ধে, তবেত বলিহারি যাই তোমার বুদ্ধি! ঈশ্বর শব্দ উচ্চারণও করিতেছ এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকারও করিতেছ। যদি বল "পরমপুরুষ

সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিতেছি এবং তাঁহার প্রতিনিধি বোধে ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি"। তাহা হইলে, তোমার মতে যে পদার্থই নাই, তাহার প্রতিনিধি সাব্যস্ত করিলে কিরূপে? হয়ত বলিবে ভাই, তাহার অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, সন্দেহ অবস্থাতেই প্রতিনিধি স্থাপন করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছি। কিন্তু, আমার মতে তাঁহার অস্তিত্বে কোন কালেই সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি অসন্দেহাবস্থায় প্রতিনিধি স্থাপন করিয়া তাহার উপাসনা করিতেছি, ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? (করতালি ধ্বনিও সাধুবাদ)

এখন একটী কথা আপনারা বিশেষ অবধানের সহিত শুনিবেন এবং বিচার করিবেন। যদি আমরা কেবল ধাতু প্রস্তরেরই পূজা করিতাম, তবে পাষাণময় শিবমূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া বলিতাম—প্রকৃতপ্রস্তাবে যদি কেবল ঐ প্রস্তর অথবা মূর্ত্তির পূজা করাই হইত; তবে যোড়হাতে বলিতাম—"হে পাষাণ, তুমি পর্ব্বতের ভগ্নপ্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছ, উপর হইতে ঢলকিয়া পড়িয়াছ, ঘড় ঘড় করিতে করিতে নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছ, তোমাকে ধড়াধড় ভাঙ্গা হইয়াছে, পরে শত শত বাটুলী এবং হাতুড়ির আঘাতে তোমাকে গড়া হইয়াছে, আমি তোমার স্তুতি করিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর" (সানন্দ করতালি ধ্বনি)। কিন্তু, দেখুন, ঐ শিবমূর্ত্তিকে আমরা কি বলিয়া স্তুতি করি:—

"একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্॥"
(কাশীখণ্ডে)

অর্থাৎ, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনি সর্ব্বস্বরূপ। ইহা সত্য—অতি সত্য যে এ সংসারে নানা পদার্থ কিছুই নাই। তিনি এক রুদ্র দ্বিতীয় নহেন। অতএব, হে পরমেশ্বর আমি এক তোমারই শরণাগত হইতেছি।

পুনরায় দেখুন,আমরা ঐ শিবমূর্ত্তির সম্মুখে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া হাত যোড় করি, এবং বেদ মন্ত্রে কেবল সেই পরমাত্মারই বর্ণনা আছে। অতএব, বলুন ত আমরা কি বেদবর্ণিত পরমাত্মার উপাসক, না ঐ প্রস্তর খণ্ডের উপাসক? (জয়ধ্বনি)।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "যদি তাহাই হয়, তবে ঐ মূর্ত্তি ও মন্দিরের প্রতি এত আগ্রহ কেন এবং উহাদের প্রতি এত আদরসৎকার ভক্তি প্রদর্শনই বা কেন? পূজার পর সময়ান্তরে কাহারও পা লাগিলে এত ক্রোধই বা কেন?"

ইহা অতি অল্পবুদ্ধির প্রশ্ন। যেহেতু ভগবৎপ্রাপ্তির যে সকল উপায় আছে, তৎপ্রতি অত্যন্ত আদর প্রদর্শন করা আস্তিক মাত্রেরই স্বভাব। অপিতু,আমরা পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপক শক্তির ভক্ত। যাহার উপর পদসঞ্চালন না করিলে কিছুতেই চলে না, এমন পৃথিবীর উপরেও পালঙ্ক হইতে নামিয়া পাদক্ষেপ করিবার সময় প্রণাম করি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাহার শ্লোক এই—"সমুদ্র মেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে।" পক্ষান্তরে যে সকল পদার্থ দ্বারা আমাদের ভগবৎপ্রাপ্তির পন্থা হয়, তাহার আদর আমরা কেন করিব না? উর্দ্দু, ফারসী ও ইংরেজী পুস্তকে কাহাকেও পা লাগাইতে দেখিলে মন সকমক করে। আর গীতা, বেদ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিকট মাথা নোয়াইব না কেন? উহাদের আদর যত্নই বা কেন না করিব? আমরা যে গৃহে বাস করি, তাহার ভগবদংশকে বাস্তুদেব বলিয়া আবাধনা করি। অতএব যে ঠাকুর গৃহের (দেবালয়ের) দ্বারে মাত্র যাইতেই আমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র সাংসারিক সংসার ভুলিয়া যায়, এবং পরমাত্মার স্মরণে শরীর রোমাঞ্চিত ও চিত্ত পুলকে পূরিত হয়, এমন ঠাকুর গৃহের আঙ্গিণায় ভূমে লোটাইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে যাওয়া কি আমার পক্ষে বড় কথা? আমরা যে মালাতে ভগবন্নাম জপ করি, তাহার আদর করি, যে স্থানে বসিয়া পরম পুরুষার্থের অনুষ্ঠান করি, তৎপ্রতি যত্ন করি, যে গুরুদেব হইতে তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করি, তাঁহাকে যতদিন বাঁচিয়া থাকি সম্মান করি। তবে যে মূর্ত্তি উদ্দেশ্য করিয়া জগদীশ্বরের সেবা করি, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কেন না প্রস্তুত হইব? (করতালি ধ্বনি) তথাপি যাহারা জিজ্ঞাসা করে, পূজান্তে প্রতিমায় পা লাগাইলে দোষ কি; তাহারাও কতক কতক বুঝিতে পারে যে, উপদেশ গ্রহণের পর গুরুকে গালি দিলে দোষ কি এবং গাভীর দুগ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে তাহাকে উদরসাৎ করিলেই বা দোষ কি। (দয়ানন্দ তাঁহার সত্যার্থ প্রকাশে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ১ম সংস্করণ দেখিবেন)।

পরন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষীয়দের হৃদয় এমন কঠিন নহে। আমরা অন্ন, জল, দোয়াত, কলম প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত সকলেরই স্তুতিবন্দনা করি। অতএব যাহাকে ভগবৎ প্রতিনিধি ও ভগবদুপাসনার প্রধান আশ্রয় মনে করি, তাহার আদর করিব না কেন?

ভাল, আমার প্রশ্নকর্ত্তা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিপূজক না হন,তিনি একবার

আপন মন বিচার করিয়া হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবেন যে, তিনিও মক্কা, মদিনা, গীর্জ্জা, মস্‌জিদ্, ব্রহ্মমন্দির অথবা আপন আপন গুরু সন্ন্যাসীর চিত্র প্রভৃতির সম্মান করেন কি না। পার্থক্য এইটুকু যে,আপনি আদর সম্মান অল্পেই সমাপ্ত করেন,আর আমরা কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে আমি এই বলিব যে, ভারতবর্ষ উপাসনা বিষয়ে পরম ভক্তিপ্রবণ, আড়ম্বর ও জাকজমক পূর্ণ। এজন্য এখানে উপাসনারও কিছু বাড়াবাড়ি হয়। কোন ও ভারতবাসী বালক আপন গুরুকে গুড্‌মর্ণিং সার্ (Good morning sir) বলিয়া হাত ঝুলাইলে তাঁহার প্রীতি হইবে না। অথবা কেবল আদাব অর্জ্জ ( সেলামালে-কম ) বলিলেও নহে। যতক্ষণ না সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গুরুদেবের চরণরজঃ মস্তকে না বুলাইবে, ততক্ষণ ভক্তির ঢেউ থামিবে না। এখন বেশ বুঝিলেন, আমাদের হৃদয়ে আদর সংকার ও ভক্তি শ্রদ্ধার এমনি প্রবল তরঙ্গ যে, যখন একবার উঠিবে তখন কাহার সাধ্য প্রতিরোধ করে? (জয় ধ্বনি)

এ প্রস্তাবের এখানে এইরূপে সমাপ্তি করিতেছি যে, আমরা "একের আরাধনা দ্বারা অপরের তুষ্টি সাধন করি না। কিন্তু, মূর্ত্তি আদিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারই পূজা দ্বারা তাঁহাকেই প্রসন্ন করিতে চাই।" (জয় ধ্বনি)

(গ) আর একবার এই অলীক প্রশ্নটী ভালরূপ দেখা যাউক। মূর্খদের পক্ষে প্রশ্নকর্ত্তা এক প্রকাণ্ড 'সঙ্গীন' প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু, আপনারা বিচারশীল, একটু স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখুন, এ প্রশ্নটী কেমন নির্ভুল (?) এবং ইহার জড়মূলই বা কেমন দৃঢ় (?)। মানিয়া লই, প্রশ্নকর্ত্তা একের পূজাদ্বারা অপরকে তুষ্ট করিতে চান না। ( মরি মরি কি অপূর্ব্ব যুক্তি!) বেশ, মানিয়া লই, আমরা পূজা করি একজনের, প্রসন্ন করাইতে চাই আর একজনকে। কিন্তু, তাহা অসম্ভব কি যুক্তি অনুসারে? বেশী দূর যাইবার আবশ্যক নাই, কিছু দিন অতীত হইল, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎবর্ষ নিরাপদ রাজ্যভোগের জুবিলী উৎসব হইয়াছিল। আপনারা বেশ জানেন, তখন কি কি ব্যাপার হইয়াছিল। কেন না আমি খুব বিশ্বাস করি, তখন যে অবোধ বালক ছিল, এমন কেহ আজ আমার বক্তৃতায় উপস্থিত নাই। (স্বীকারে করতালি ধ্বনি) দেখুন সে সময় কি কি ঘটনা হইয়াছিল—তখন লক্ষ কোটী দীপাবলী প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল। সাগর পোত হইতে পর্ব্বতশিখর পর্য্যন্ত তরু তরু ধ্বজা পতাকা উড্ডীন করা হইয়া-

ছিল। পুষ্প পত্রের অগণিত মালায় সুশোভিত হইয়া নগরী সকল অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। জেলায় জেলায়, পরগণায় পরগণায় বৃহৎ বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে বহুধা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বড় বড় মূর্ত্তি ও ছবি লট্‌কান হইয়াছিল, এবং তাহার উভয় পার্শ্বে আম্রপল্লবসহ মাঙ্গলিক পূর্ণকুম্ভ স্থাপন ও পুষ্পজালরচনা করা হইয়াছিল, এবং ধ্বজা পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক এক প্রধান সিংহাসনোপর তৎ তৎ প্রদেশের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে অতি যত্ন ও সম্মানের সহিত উপবেশন করা হইয়াছিল। তাঁহাদের সম্মুখে কতইবা নিশান উড়ান হইয়াছিল; কতই না কবি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। কতই না তাল মান লয় ও নৃত্য ভঙ্গীর সহিত "God save the Queen" গান গীত হইয়াছিল। এবং সিংহাসনারূঢ় প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে এতদূর সম্মান করা হইয়াছিল, যেন সাক্ষাৎ মহারাণী উপস্থিত হইয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাসা করি, বলত ভাই এ সমস্ত কেন? এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ভিতরে ইহা কেন? যেখানে মূর্ত্তিপূজার নাম শুনিলে লোকে কানে আঙুল দেয়, সেখানে এ ঘোর অনর্থ কি নিমিত্ত? যাঁহারা চলাইয়া বেড়াইতেছেন যে "পূজার দীপালোক কি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত যায়? কীর্ত্তনের আওয়াজ কি স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছে?" সেই সকল বিশাল বুদ্ধি enlightened, civilized, critic ও scientific মহাশয়দিগের সভ্য সমাজেও আজ দীপাবলী ও গীত-বাদ্য কিজন্য? (জয়ধ্বনি ও হাস্য)।

জুবিলী উৎসবের প্রত্যেক দীপালোক কি ইংলণ্ডে মহারাণীর আবাসকক্ষে পৌঁছিয়াছিল? যদি যেয়ে থাকে, তাহা হইলে না জানি কোটি কোটি প্রদীপ, মশাল ও বৈদ্যুতিক আলো দেখিয়া মহারাণীর কেমন চমক লাগিয়া গিয়াছিল! (করতালি)।

প্রত্যেক বাজী, বন্দুক, তোপ ও গীত বাদ্যের মহানাদ কি মহারাণীর কর্ণে পৌঁছিয়াছিল?—যদি হয়ে থাকে, তবে ত তোমরা এমন জুবিলী উৎসব করিয়াছ যে, কাণে তালা লাগাইবার পন্থা! (জয়ধ্বনি ও করতালি)।

এখন বলুন ত আপনারা মূর্ত্তিউপাসকদিগকে মাথা মুণ্ড যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনাদিগকে কি কেহ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না?—আপনারা মহারাণীর মূর্ত্তির মহাপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সন্তোষ কিরূপে হইবে?

আপনারা যে গুম্ফশ্মশ্রুবিলম্বিতবদন রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে পতাকা উড়াইয়া রাশি রাশি ফুলের অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাঁহারাই কি মহারাণী? নতুবা জুবিলী হইল রাণীর, আর অপরকে এত অঞ্জলি দিয়া উৎসব করিলেন কেন?

রাণী কি জন্ম বয়সেও কভু প্রদীপের আলো দেখেন নাই বা বাদ্য বাদন শুনেন নাই, যে আপনারা সকলে এই সকল দ্বারা তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে এত ধূম করিলেন?

আপনারা ইহা কোন্ যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আতসবাজী ও লক্ষ লক্ষ মণ তৈলের সহিত কোটি কোটি মুদ্রায় আগুণ জ্বালাইলে মহারাণী চক্রবর্ত্তিনী প্রসন্না হইবেন?

যে টাকা আজকাল ভারতবাসীদের রুধির বিন্দুবৎ গণ্য হইতেছে, তাহা কোন্ গ্রন্থের কোন্ যুক্তি অনুসারে, কোন্ বৈদিক প্রমাণের বলে মহারাণীর অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধি-পূজনছলে, ধূলায় মিলাইয়া দেওয়া হইল? (বিশেষ জয়ধ্বনি)।

যদি বলেন, "আমার রাজ ভক্তির উচ্ছ্বাস আমি রাখিতে পারি না, এতে যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক।" তবে উপাসকেরাই বা কবে ভক্তির উচ্ছাস থামাইতে পারিয়াছে? অথবা যদি বলেন, 'উৎসবের আওয়াজ রাণীমার কান পৌছাইবে না বটে, সুগন্ধ তাঁহার নাক পর্য্যন্ত ছড়াইবে না বটে, কিন্তু, যখন ভারতেশ্বরী মহারাণী জানিতে পারিবেন যে, ভারতবাসীরা তাঁহার জন্য এত আনন্দ অবশ্যই উৎসব করিয়াছে, তখন তিনি প্রসন্না হইবেন। অতএব পক্ষান্তরে যে জগদীশ্বরের পূর্ণসত্তা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যিনি সমস্তই দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন, যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে— "His centre is every where and circumference no where" (তাঁহার কেন্দ্র সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু পরিধি কোথায়ও নাই!), তিনি অবশ্যই আমার প্রার্থনা শুনিতেছেন, এবং আমার অনুষ্ঠান দেখিতেছেন।

তিনি কি আমার অকপট হৃদয়ের সত্যভাব অবগত হইয়াও প্রসন্ন হইবেন না? (করতালিবাদ্য)।

যদি বলেন, এই সকল হাকিম ও চিত্রকে আপনারা মহারাণীর প্রতিনিধি মানিয়াছেন; তবে আমি কাহাকেও পরমাত্মার প্রতিনিধি মানিলে কি কিছু দোষ হয়?

বলিতে পারেন, 'রাণী প্রসন্না হউন বা অপ্রসন্না হউন, রাজতত্ত্ব বুঝিতে

পারে কাহার সাধ্য; কিন্তু আমরা প্রজার যাহা কর্ত্তব্য করিয়াছি, তবে, "শিবতত্ত্বং নজানামি কিদৃশোঽসি মহেশ্বর যাদৃশোসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ" এরূপ বুঝিয়া যাহারা সেবা করিতেছে,তাহাদেরই বা অপরাধ কি?

যদি বলেন, 'মহাশয়, আমাদের রীতিই এই যে, এইরূপ সময়ে এইরূপ উৎসব করিতে হয়, তাহাই করিয়াছি।' তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকদিগের রীতি নীতি উপহাস করা হয় কেন?

আপনাদিগকে এই বৃথা প্রশ্নের চরকায় ঘুরাইয়া আর কত সময় নষ্ট করিব। বুদ্ধিমানের পক্ষে "থোরাই বহুত"। আপনারা ভাবিয়া দেখুন,যাহারা স্বয়ং একব্যক্তির পূজাদ্বারা অপরকে সন্তুষ্ট করিতে চায়, তাহাদের ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে প্রশ্ন করা কিরূপ অজ্ঞতার পরিচায়ক। এ প্রকরণের ফলিতার্থ এই বুঝিবেন যে,—

"যখন প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ংই একজনের আদর সৎকারদ্বারা অপরকে সন্তুষ্ট করা স্বীকার করিতেছেন, তখন এ প্রশ্ন কিরূপে করিলেন?"

(ঘ) এখন তর্কের খাতিরে বলি, ভাই, স্বীকারই না হয় করিলাম, যে মূর্ত্তি পূজকেরা ভ্রান্ত এবং নিয়ত ভ্রমপথেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধন-মন-তনু ক্ষয় করিতেছে; তবুও কি ঈশ্বর ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন না?

পরমাত্মা ঘটে ঘটে চরাচরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানিমায়য়া" (গীতা)। "অল্লাং অকরবী এলেকা মিন্ হব্লিল্ বরীদ" (কোরাণ)। "দিলকে আয়নে মে হায় তসবীরে যার। জব জরা গরদন ঝুকাই দেখলী।" তিনি ত সবই জানেন, তবুও কি সেই সর্ব্বশক্তিমান হৃদয়ে বসিয়া আমাদের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতেছেন না। তিনি কি অবগত হইতেছেন না, শত শত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' বলিয়া উৎসবে মাতিয়া নৃত্য করিতেছেন, ইঁহারা তাঁহাকেই প্রসন্ন করিতে উন্মত্ত হইয়াছেন। তিনি কি জানেন না যে, উঁহারা তাঁহাকেই ভাবিয়া 'কৃষ্ণ' ব'লে ডাকিতেছেন! তিনি কি দেখিতেছেন না যে উহাদের আপন আপন পরিধেয়বাস এবং শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই; এবং উঁহারা কৃষ্ণনামে বিভোর হইয়া আনন্দ অশ্রুতে ধরণী অভিষিক্ত করিতেছেন, ইহা তাঁহারই প্রতি পূর্ণ অনুরাগের প্রভাব! তাঁহার কি এ বোধ নাই যে, এ সকল বেচারীরা হিমালয় হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গঙ্গাসাগর হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত

প্রতি নদীতে ও প্রতি জলাশয়ে অবগাহন করিতেছে এবং মন্দিরে মন্দিরে জয় জয় নাদে অচৈতন্ত হ'য়ে ভূমে লোটাইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতেছে, ইহা কেবল তাঁহাকেই পাইবার জন্ত? সেই সর্ব্বজ্ঞের কি এতটুকুও জ্ঞান নাই যে, "ইহারা সকলে আমার প্রতি এতদূর অনন্তপ্রেমিক ও বিশ্বাসী যে আমার জন্ত স্ত্রীপুত্রের স্নেহ ত্যাগ করিয়াছে, উত্তম অন্ন বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছে, শরীরকে কিছুমাত্র গণ্য করিতেছে না—এই দারুণ শীতে হিমালয়ের হিম প্রদেশে কাশীও দৌর্ব্বল্য হেতু শিথিল কণ্ঠে আমারই নাম গান করিতেছে; রিক্তপদে ক্ষত বেদনা অগ্রাহ্য করিয়া আমারই নামে নাচিতে নাচিতে দারুণ হিমে জড়হস্তে ধ্বজা উড়াইতে উড়াইতে আমাকেই পাই বার বিশ্বাসে বৈদ্যনাথ চলিয়া যাইতেছে।" তিনি কি ইহা দেখেন না যে, "ইহারা আপন প্রাণ নিষ্কাশিত করিয়া আমার চরণে সমর্পণকারী এমনই এক কঠিন যোগী সমাজ, যে যেই শুনিতে পায়, হিমালয়ে গলিলে ঈশ্বর মিলিবে, অমনি গলিতে তৈয়ার; যদি শুনিতে পায়, আগুনে জ্বলিয়া মরিলে ভগবল্লাভ হয়, অমনি পুড়িয়া মরিতে প্রস্তুত; যেই শুনিবে, জগন্নাথ দর্শনে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়, অমনি—করুক না কেন আত্মীয়বান্ধব দাদা ভাই বলিয়া ডাকাডাকি, হউক না কেন চক্ষের সম্মুখে হাজার হাজার যাত্রীর ব্যাধি মরণ, মরুক না কেন সহযাত্রীগণ ভীষণ আরণ্যক হিংস্রজন্তুর কালকবলে, হউক না কেন মাঙ্গিয়া চাহিয়া পাথেয় সঞ্চয়ের প্রয়োজন—তথাপি সকল বি পদ তুচ্ছ করিয়া জগন্নাথ দর্শনে প্রস্তুত হইবে!" তিনি কি ইহা বিদিত নহেন যে, "ইহাদের রোমহর্ষ, শরীর কম্প, গদ্‌গদ ভাষ ও প্রেমাশ্রুপাত আমারই স্মরণে হইতেছে?"

তিনি কি ঐ অপর বিরোধী পক্ষ সম্বন্ধেও কিছু অবগত নহেন যে, 'উহারা সেই সমাজ, যাহাদের আমাতে বিশুদ্ধ ভক্তির নিন্দা করাই প্রধান কর্ত্তব্য।' তিনি কি বুঝিতে পারেন না যে, 'উহারা সকলে অপরিপক্ক চঞ্চল-হৃদয় অর্ভক। উহারা একদিন মুসলমানের কোরাণ বগলদাবা করিয়া আমার নিকট আসিতেছে—দ্বিতীয় দিন কোরাণের উপর দন্ত কড় মড় করিয়া বাই-বেলের যশঃ ও শক্তি কীর্ত্তন করিতে করিতে চার্চের দ্বারে উপনীত। তৃতীয় দিন বাইবেলেরও শ্রাদ্ধ করিয়া চার্চের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদের ভ্রমে পড়িয়া 'বেম্ম বেম্ম' করিতে থাকে। চতুর্থ দিন বেদের নাক কান কাটিয়া কেবল হোটেলে প্রস্তুত সাহেবী খানার পর জিহ্বার জল ফেলিতে ফেলিতে হাতগড়া, মনগড়া, মূর্খতাব্যঞ্জক শত শত নামে স্তুতি করিতে

করিতে যত্ন, কিন্তুপরন্তু, যা-ইচ্ছে-তাই, স্বেচ্ছাচার একটা কিছু হইয়া যায়, এবং পঞ্চম দিন সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নাস্তিক হইয়া পড়ে।

বাবা, আমরা ত এই বুঝি যে, স্বীকারই যদি করা যায়, মূর্ত্তিপূজকেরা ভ্রান্ত এবং তাহারা অনুপায়কে উপায় এবং অপথকে পন্থা বুঝিয়াছে। কিন্তু, তথাপি তাহাদের হৃদয় খাঁটি, প্রেমপূর্ণ ও দৃঢ় হইলে যে ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে, এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পরন্তু অন্যেরা সত্য বটে তিলক কাটিয়া চেহারা খারাপ করেন নাই, সত্য বটে সাবান মাখিয়া গৌর হইয়াছেন এবং যথার্থ বটে, জাতিভেদের শতবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু,—

"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া, শুধ্যেৎভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥"

অপিচ—"ভক্ত্যাত্বনন্যয়ালভ্যো হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনম্।"

ভক্ত কবির দাস বলিয়াছেন "সাঁচে মন্‌কে মীতা প্রভু হো সাঁচে মন্‌কে মীতা।" (খাঁটি মনের বন্ধু প্রভু, খাঁটি মনের বন্ধু)। বলুন ত আমরা খাঁটি মন ও নিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা করিব, না তাহাদের গুণ গাইব, যাহারা সকল সময় কেবল পরনিন্দায় ব্যস্ত থাকে, এবং আপন উপাসনা "কাল অন্ন যোগাইয়াছ প্রভু, আজও পেটে দুটো ভাত দেও'', এইরূপ বাক্যে পরিসমাপ্ত করে ?

মোট কথা,—"যদি স্বীকারই করা যায়, মূর্ত্তি পূজকেরা ভ্রান্ত, তথাপি তাহাদের নিশ্চল ভক্তিভাব থাকিলে ঈশ্বর লাভ হইবে, কিন্তু যাহারা নিত্য নিত্য নূতন নূতন মত সৃষ্টি করে এবং ছলেবলে কৌশলে অপর সাধারণকেও আপনাদের দলভুক্ত করিতে চায়, তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি কখনও সম্ভব নহে।" (জয়ধ্বনি)।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে,—

(২) "নিরাকারের আকার কল্পনা কিরূপে ?"

ভাই, ইহাতে সাকার এবং নিরাকারের প্রপঞ্চ। নিরাকার ও সাকারবাদের ন্যায় দুরূহ ও গভীর বিষয়ে উভয় পক্ষের যুক্তিতে শত সহস্র গ্রন্থ সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে। তাঁহাদের যতদূর অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও শাস্ত্রানুশীলন ছিল, তাহা আজকালের কলহপ্রিয় নব্য যুবকদের স্বপ্নগোচরেও উদিত হয় নাই।

যিনি এ প্রশ্ন করিবেন, তিনি অবশ্যই নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের নিরাকার

জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। অতএব মূর্ত্তি পূজকদের জীবনধন সাকার-বাদ সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট বিবৃত করিতেছি।—

(ক) সম্ভবতঃ আপনাদের স্মরণ আছে, প্রথম প্রশ্নের আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্ম এবং জগৎ অভিন্ন। এতদ্বারা প্রথমে ব্রহ্ম সাকার সিদ্ধ হইল। কেন না তিনি আকারী হইতে অভিন্ন; অতএব অন্ততঃ আকারের আশ্রয় হইলেন।

(খ) কেহ কেহ বলিতে পারেন, "কার্য্য দশায় জগদ্রূপ ব্রহ্ম সাকার সিদ্ধ হইলেও কারণ স্বরূপে নির্লেপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এ যুক্তি অনুসারে, সাকার সিদ্ধ হইতেছেন না।" এ কথা প্রকৃত নহে। যেহেতু মূর্ত্তি পূজকেরা প্রায়ই সৎকার্য্যবাদী। এবং সৎকার্য্যবাদের তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্য প্রকা-শের আদিতেও কোনও না কোন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যাহা প্রথমে নাই, তাহা কিছুতেই পরেও প্রকট হইতে পারে না। তিল হইতে তৈল প্রকট হইতে পারে, কিন্তু বালু হইতে তৈল কিছুতেই নির্গত হয় না। এ সিদ্ধান্তেও ভগবদ্ বচন আছে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে-সতঃ।" ভগবান ঈশ্বর কৃষ্ণের সাঙ্খ্যকারিকা, "অসদকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্।" শ্রুতি "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ।" ইত্যাদি।

(গ) সাকারবাদ বেদে পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে।—

"সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" পুরুষ প্রবরের সহস্র মস্তক, সহস্রচক্ষু এবং সহস্র চরণ। ইহার অর্থ কি কোন নব্য বৈদিক এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার না আছে মস্তক, না আছে চক্ষু, না আছে পদ?

(জয়ধ্বনি)

যদি কেহ বলে, "মহাশয় এই সূত্র ত বিরাট পুরুষের বর্ণনা করিতেছে।" তাহাকে পরাস্ত হইয়া বলিতে হইবে, তুমি গণ্ডমূর্খ, তোমার পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান অণুমাত্রও নাই। দেখ, বেদ প্রথম মন্ত্রে 'সহস্র শীর্ষা,' বলিয়া তাঁহাকে সাকার বলিয়াছেন, পরে 'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যৎভূতং যচ্চভাব্যম্" বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়াছেন। পুনরায় তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "ততো বিরাডজায়ত" (তাঁহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হইলেন)। এখন প্রথম মন্ত্রই বিরাট্ বর্ণনে কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে?

(করতালি ও জয়ধ্বনি)

পুনশ্চ বেদ ইহা অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখাইতেছেন,"অগ্নির্দেবতা বাতো

দেবতা'' ইত্যাদি এবং 'নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ'' ইত্যাদি। এখন দেখুন কেবল জগতের রূপ হইতে ঈশ্বরের সাকারত্ব সিদ্ধ করিয়া বেদের সন্তোষ হইল না। পরন্তু প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারে রামকৃষ্ণাদিরূপ প্রকট করিয়া লইতে পারি। এইরূপ বিশেষ আকার লক্ষ্য করিয়া বেদ বলিতেছেন, "যাতে রুদ্রশিবাতনূর ঘোরা পাপকাশিনী।" "বাহুভ্যামুতত নমঃ।" ''সবা-হুভ্যাম্ধমতি।'' ইত্যাদি। যুক্তিতে যদি ভিন্ন ভিন্ন আকার রূপ ও গুণের ভাণ্ডারকে ঈশ্বর হইতে পৃথক মানা যায়, তবে নিরাকার, নিরীহ, নির্গুণ, মন ও বাক্যের অগোচর, জগৎ হইতে অসম্বন্ধ পরমাত্মাকে মানা না মানা উভয়ই সমান। যদি কেহ বেদাদি প্রমাণ মানেন ত বেদ হইতেও সাকারতা অধিকতর সিদ্ধ হইতেছে। (এবিষয়ে সবিশেষ দেখিতে হইলে বেদান্ত সূত্রের অনুভাষ্য দেখিবেন)। আমার ঐ ব্রহ্মবাদী ও নিরাকারবাদী বালকদিগের প্রতি কৃপা হয়, যে তাহারা গীতার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও ঈশ্বরের সাকা-রতায় সন্দেহ করে।

যে গীতা স্বয়ং পরমাত্মা সাকাররুষ্ণরূপে প্রচার করিয়াছেন, যে গীতায় সাকাররূপে ভগবান্ ''অহং বিবস্বতে যোগম্'' "পশ্য মে পদার্থ রূপানি", ''বিশ্বস্য চাহং হৃদি সংনিবিষ্টঃ'', "মামেব যে প্রপদ্যন্তে'', ''মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ","মামেকং শরণং ব্রজ'' প্রভৃতি শত শত বাক্যে সেই সাকার রূপকেই-ব্রহ্মস্বরূপ ও ঈশ্বর রূপ মানিয়া সর্ব্ববাপী আমার শরণ লও ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সে গীতা মান্য করিয়া, আমি জানিনা, কোন্ মুখে কে বলিতে পারে, যে 'ঈশ্বর সাকার নহেন'! (জয়ধ্বনি)

যদি ঈশ্বর সাকার না হন, তবে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ছিলেন না। যদি কৃষ্ণ ঈশ্বরই ছিলেন না, তবে তিনি গীতায় অর্জ্জুনকে শরণে আনা এবং নিজের সর্ব্ববাপকত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট হওয়া কেন প্রকাশ করিলেন? এবং স্পষ্ট ভাবেই কেনই বা বলিলেন "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাব-মজানন্তো মম লোকমহেশ্বরম্।" (আমি মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়াছি এজন্য মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে এবং আমার প্রভাব জানে না যে আমি লোক মহেশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি)।

এখন বলুনত, যখন পরমেশ্বরের সাকারতাই সিদ্ধ হইয়া গেল, তখন এ প্রশ্নের নিশ্বাস ফেলিবার অবসর কোথায়?

(জয়ধ্বনি ও করতালি বাদ্য)

(ঘ) প্রশ্ন হইতে পারে "যদি সৃষ্টির পূর্ব্বেই আকার ছিল, তবে সৃষ্টিদ্বারা কি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে ; অথবা যদি আদিতে আকার না থাকে, তবে সেই অবস্থায় নিরাকারতা সিদ্ধ হইতেছে"। ইহার উত্তর এই—কোন প্রস্তরখণ্ডে এক নিপুণশিল্পী যথাভিরুচি গাছ, পালা, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি খোদাই করিয়া গড়িতে পারে। বেশ, এই সকল আকার কি সে বাহির হইতে আনিয়া উহাতে বসাইয়া দেয়, না প্রথম হইতেই উহাতে ছিল? বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, এই পাথরের টুকুরায় সে যে ঘোড়া বানাইয়াছে তাহার আকৃতি প্রথম হইতেই উহাতে ছিল এবং আরও কতক পাথর ঐ আকৃতির চারিদিক বেষ্টন করিয়াছিল। কারিকর কেবল সেই অতিরিক্ত প্রস্তর অংশটুকু বাঁটালি দ্বারা ছাটিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন আকৃতিকে প্রকট করিয়াছে মাত্র। এইরূপে পরমাত্মায় তিরোভূত ও প্রচ্ছন্ন আকার সৃষ্টিদ্বারা বিকাশ হয় মাত্র। আরও দেখুন যেমন একঘনহাত এক প্রস্তরখণ্ড হইতে উহা অপেক্ষা ছোট ছোট যত প্রকার আকৃতি সম্ভব প্রকট করা যাইতে পারে এবং এজন্য উহাকে কোটি কোটি আকারবিশিষ্টও বলা যাইতে পারে ; পরন্তু উহাকে একহাত পরিমাণের বৃহত্তর কোনও আকৃতি নাই। এবম্প্রকারে পরমাত্মায়ও তাঁহা হইতে ক্ষুদ্রতর সকল প্রকার আকৃতি রহিয়াছে, কিন্তু বৃহত্তর কিছুই নাই। অপিচ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক ; অতএব তাঁহা হইতে বৃহত্তর কোন পদার্থের অস্তিত্বই অসম্ভব। সুতরাং পরমাত্মায় সকল প্রকার আকারের বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইল। এখানে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রস্তর জড় ও অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্য পদার্থ। এ নিমিত্ত উহার আকারপ্রকাশ পরাধীন (অন্য সাপেক্ষ) এবং উহার কতকাংশ পৃথক করিয়া যে আকার প্রকট করিতে হইবে, তাহার চারিদিকের প্রস্তারাংশের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হয়। পরন্তু, পরমাত্মা চেতন, অদ্বিতীয় এবং স্বয়ং প্রভু। এজন্য আপনার ইচ্ছায়ই জগৎ প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনি সর্ব্বব্যাপক ; অতএব খণ্ডরূপও হননা এবং অংশবিশেষ পৃথক করিতেও হয় না। কেননা, সর্ব্বব্যাপকে ইহা সম্ভব নহে।

(চ) যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, নিরাকারবাদিনী-শ্রুতির কি গতি হইবে?"

সত্য সত্যই ঈশ্বরের অলৌকিক আনন্দময় (আনন্দমাত্রকর পাদমুখোদরাদিঃ) রূপ (আকার), এবং আমাদের লৌকিক অস্থিমাংসময় রূপ;

অতএব নিষেধক শ্রুতির লৌকিকাকার নিষেধে তাৎপর্য্য আছে এবং বিধাত্মক শ্রুতির অলৌকিক আনন্দময় রূপ বর্ণনেও তাৎপর্য্য আছে। এজন্য শ্রুতি বিরোধ নাই।

ঐ রূপ বর্ণনার প্রণালী লৌকিকেও দেখিতে পাই; যেমন, "এ প্রস্তর খণ্ডের আকার ঘোটকের ন্যায় নহে", অর্থাৎ প্রকট নহে, ইত্যাদি।

(ছ) একথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে ঈশ্বরের সর্ব্বাকারতা (সর্ব্বরূপ) এমনই যে, নিরাকারতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মেলামেশা! ইহার এক উদাহরণ শুনুন।——

অনেকের মত সূর্য্য রশ্মিতে সকল রঙ্গের সমাহার বিদ্যমান আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থসংযোগে ভিন্ন ভিন্ন রং প্রতিফলিত ও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু, ইহারা এমন ভাবে সংমিলিত হইয়া আছে যে, সাধারণ অবস্থায় বিবেচনা হয়, উহাতে কোনও রং নাই। অপর মতে বলে, সূর্য্যকিরণে কোনও রঙ্গই নাই (থাকিলেও তাহা উজ্জ্বল শুক্ল)। পদার্থেরই রং সূর্য্য কিরণ সংযোগে প্রকাশিত হয়। যদি সূর্য্যালোকের রং থাকিত, তবে যেখানে রশ্মিজাল উদ্ভাসিত হয়, সেইখানেই কৃষ্ণ, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি রংএর চটক ছাইয়া ফেলিত। উত্তরে, প্রথমমতবাদীরা বলেন যে, রবি কিরণে যে সকল রংঙ্গের সংঘাত তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখাইয়া দিতেছি। অনন্তর তাহারা এক ত্রিকোণ ত্রিধার কাচখণ্ড (Prism) রৌদ্রে রাখিয়া দেখাইয়া দেন, উহার ভিতর দিয়া সূর্য্য-রশ্মি অতিক্রম করিলে নানা রংঙ্গে (Vibgyor) বিভক্ত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তখন তাঁহারা দৃঢ়ভাব সহিত বলেন, 'দেখ, ইহা ঠিক কিনা যে, কিরণে সপ্ত রং মিলিত হইয়া রহিয়াছে।' কিন্তু অপর পক্ষীয় লোকেরা ইহাতেও বলিয়া থাকেন, যেমন পারদও কাল নহে, গন্ধকও কাল নহে কিন্তু উভয়ে মিলিয়া কাল কজ্জলি উৎপন্ন হয়। না হলুদ লাল, না চূণ লাল, কিন্তু উভয়ের মিশ্রণে লাল রং উৎপন্ন হয়। না হরিতাল হরিৎ, না নীল হরিৎ উভয়ের মিলনে হরিৎ বর্ণের সৃষ্টি হয়। সেই রূপ না কাচে আছে রং সমষ্টি, না কিরণে আছে রং সমষ্টি; পরন্তু উভয়ের সংযোগে সপ্ত রং উৎপন্ন হইয়া যায়। (করতালি বাদ্য)

বলুন ত, ইঁহাদের পরাস্ত হইলেন কে? এবং সত্যই বা কাহাদের মত। মনোযোগ পূর্ব্বক দেখুন যে "সবকী হ্যায় ছোট্ নিশানে পর।" 'যত সব নদ নদী সাগর পানে ধায়।' যাহারা আলোকে সপ্ত রংএর অস্তিত্ব বুঝাইতেছেন,

নব্য তন্ত্রের দেশোন্নতিকারী ছেলে ছোক্‌রা সম্প্রদায় জগৎময় এক এবং অদ্বিতীয় মত প্রচার করিয়া শান্তি স্থাপনা করিতে চায়, এবং এই উদ্দেশ্যে অপর সকল মতের খণ্ডন ও নিন্দা করিয়া সকলের প্রাণে আঘাত দিতেছে এবং নিদারুণ অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, তাহারা আপন আপন কর্ণ দুহাতে ধরিয়া একবার শুনুক ও চক্ষু মেলিয়া দেখুক, ভারতবর্ষীয় পূজনীয় আর্য্যঋষিদের মত কেমন গম্ভীর ও উদার—তাঁহারা কেমন নির্ব্বিরোধ হইয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, যেমন করিয়া মান, এবং যেমন করিয়াই ভজনোপাসনা কর, ঈশ্বরে সবই সম্ভব। তাঁহাকে আল্লাই বল, আর গড্‌ই ( God ) বল, তাঁহার সহস্র নাম। তাঁহাকে মক্কায়ই খোজ, আর কাশীতেই খোজ, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁহাকে সাকারই বল, আর নিরাকারই বল, তিনি সর্ব্বরূপ। দেখুন, এই আধুনিক ধর্ম্ম-প্রচারকদের হৃদয় কতদূর সঙ্কীর্ণ যে, ইহারা রামপরীক্ষাদি হিন্দুধর্ম্মবিষয় খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহারা সত্যার্থ প্রকাশের ধ্বজা উড়াইয়া খৃষ্টান, মুসলমানাদি সকলের মত খণ্ডন করিয়া সকলকেই অন্ধকারে মনে করিতেছে; কেবল নিজেরাই প্রকাশময় অগ্নিবৃক্ষ! ভাবিতেছে। ( জয়ধ্বনি ও করতালি )

(ঝ) কি আশ্চর্য্যের কথা; ইহাতেও কেহ কেহ বলিয়া উঠেন, ইহা ধারণায় (Idea) ও আসেনা যে,এমন পদার্থ সম্ভব, যাহা ক্ষুদ্রতমও হইবে বৃহত্তমও হইবে। বল বাপু,তোমার ধারণাই কত বড়! তুমি সামান্য একগাছি তৃণের ও সম্পূর্ণ তত্ত্ব জাননা—এত লম্বা চৌড়া অঙ্কশাস্ত্র পড়িয়া, ২ দুই এই সংখ্যার বর্গমূল ঠিক্ ঠিক্ বাহির করিতে পার না। কিন্তু যে তত্ত্বে বেদ পর্য্যন্তও থতমত খাইয়াছেন, তাহা যদি তোমার বুদ্ধিতে না আসে, তবে কি তোমার ধারণা অনুসারে তাহাকে ডাল ভাত বলিয়া বুঝাইতে হইবে?

(ট) ভাল তুমি কি এমন প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, যাহা ধারণায় না আসিবে, তাহা কখনও করিবেনা এবং কেবল যাহা বুঝিতে পারিবে, তদনুসারেই চলিবে? জন্মমাত্রেই দুগ্ধপান করিয়াছ না বুঝিয়া, খেলা করিয়াছ না বুঝিয়া এবং পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ না বুঝিয়া। এখনও ত দেখি না যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া, খুব ভাল করিয়া লাভ লোকসান বুঝিয়া, পরে ডাক্তারের ঔষধ খাইতে; রেল এবং জাহাজের বিদ্যা খুব ভাল করিয়া আগে বুঝিয়া তবে গাড়িতে বা জাহাজে উঠিতে। হার্ম্মোনিয়ম কি রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, কিছু জানিনা, কিন্তু সন্ধ্যার বাতি জ্বলিলেই কাঁ্যা কাঁ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া

দেই। ভৈরবীতে কেন কোমলসুর লাগাইতে হইবে, মালকোশে কেন পঞ্চম ও ঋষভ ছেড়ে দিতে হইবে, ইহার কিছুই জানি না; কিন্তু আ, আ, আ, তানা নানা না আলাপন করিতে থাকি। ইহা সম্যক্ ভাবিয়া দেখুন এবং বুঝিয়া লউন যে, প্রত্যেকেই নিজে বুঝিবার পূর্ব্ব হইতেই এই সকল কাজ করিতে আরম্ভ করে এবং পরে বুঝিতে পারে,—কেহ কেহ নাও বুঝিতে পারে। শুনিয়াছি বায়ুর অংশ বিশেষ ইথর ( Ether ) সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত আজ পর্য্যন্তও কিছুই হয় নাই, তাই বলিয়া কি কেহ বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন না? চন্দ্রমণ্ডলের পূর্ণতত্ত্ব সঠিক কিছু অদ্যাপি জানা যায় নাই, তাই বলিয়া কি জ্যোৎস্না আসেনা? সেইরূপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও পূর্ণতত্ত্ব সম্যক না বুঝিতে পারিলেই কি তাঁহার উপাসনা করিব না? ইহা উল্লেখকরা যাইতে পারে "যদিও আমি দুধ, জল, ঔষধ, হার্ম্মোনিয়ম ও রাগ রাগিণী বিষয়ে কিছু বুঝিনা, কিন্তু যাঁহাকে মনে করি আমা হইতে বেশী জানেন এবং আমাকে এ সব বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন, তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমি খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, ও রেল জাহাজাদির ব্যবহার করি; এবং বায়ু ও চন্দ্র যাহাই হউক না, উহাদের হইতে যে লাভ হয়, তাহাও বেশ জান আছে।" বেশ, এখন আমি আপন বিশ্বাসপাত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যদিগের উপদেশ অনুসারে কেন চলিব না এবং যে মূর্ত্তি পূজাদ্বারা হৃদয়ে পরম শান্তি ও অপূর্ব্ব আনন্দ স্বয়ং অনুভব করি, তাহাই বা কেন অনুষ্ঠান করিব না? ( জয়ধ্বনি )

(ঠ) যদি বলেন, পরমাত্মা ক্ষুদ্র হইলেও বৃহৎ, সাকার হইলেও নিরাকার, ইহা ত অসম্ভবের ন্যায় বোধ হয় এবং ইহা স্বীকারই বা করা যায় কিরূপে?

হাঁ সত্য বটে, ইহা অসম্ভববৎ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অসম্ভব কি সম্ভব কে বলিতে পারে? দেখুন, যতদিন তারে খবর দেওয়া আবিষ্কার ও প্রচলিত না হইয়াছিল, ততদিন ইহা অসম্ভব মনে হইত; কিন্তু এখন আর অসম্ভব নহে। সেইরূপ বুঝিতে না পারিলে অসম্ভব বোধ হয় বটে, কিন্তু একবার অবগত হইলে আর অসম্ভবতার লেশ মাত্রও থাকে না। আমরা মায়াবদ্ধ জীব এবং অল্পজ্ঞ, সেই মহাপুরুষের পূর্ণ রূপ বুঝিতে পারি না; সুতরাং তাঁহার গুণ ও তত্ত্ব কিছু অসম্ভববৎ বোধ হইলেও আচার্য্যদিগের উপদেশ ও আপন আপন বিশ্বাস অনুবর্ত্তন করিবা চলিতে থাকি।

(ড) ভাল একটী কথা, যাহা অসম্ভব বোধ হয়, তাহা কি একেবারেই মানেন না? কি আশ্চর্য্য! আমি ত এমন কাহাকেও দেখিনা, যে আজকালকার প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে আপাততঃ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করে না।

(১) প্রথমে বাহ্যবিদ্যার (Physical Science) প্রতি দৃষ্টি করা যাউক, যাহার প্রভাবে ধকাধক রেল দৌড়িতেছে, কোথায়ও বা বাষ্পীয় পোত ভকাভক ধূম উদগীরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। যে বিদ্যার প্রভাবে পলকে পলকে সাবয়ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চেহারা (Photography) উঠিতেছে এবং যে বিদ্যার গৌরবে অগ্নিজলবায়ু (প্রভৃতি ভূতগণ) দাসনুদাসের ন্যায় আজ্ঞাবহ হইয়াছে, সেই বিদ্যার মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন, তাহা পরমাণুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বলুন ত, আজ পর্য্যন্ত কেহ কি কথনও পরমাণু দেখিয়াছে? যাঁহারা বলেন পরমাণু পদার্থের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ, তাঁহাদের কেহ কি কোনও পদার্থ বিভাগ করিতে করিতে এমন ক্ষুদ্র অংশে উপনীত হইয়াছেন, যাহাকে আর বিভাগ করিতে না পারিয়া তাহার পরমাণু নাম রাখিয়াছেন?

যুক্তিবলে এমন পদার্থের অস্তিত্বই অসম্ভব বোধ হয়, যাহা সকলের ছোট, অথচ তাহার ছোট কিছুই হইতে পারে না।

অনুমান করুন একবিন্দু জলে কত পরমাণু হইতে পারে। মনে করুন, হাজার, দশ হাজার বা এক লাখ। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা আধসের পরিমাণের একশিশি জলে একবিন্দুমাত্র ঔষধ ঢালেন, এবং দু চারিবার ঝাঁকিয়া তাহার একবিন্দু আর এক শিশি জলে ফেলেন, ঐ রূপ ঝাঁকিয়া তাহা হইতেও একবিন্দু একবিন্দু করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ শিশিতে মিলাইয়া পঞ্চদশ বা বিংশ, ত্রিংশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যান। তথাপি না জানি উহার এক বিন্দুতেও কত পরমাণু রহিয়া যায়, যে সেই ঔষধের ফলও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। একরতি পরিমাণ সুবর্ণের সূক্ষ্ম তার টানিয়া গেলে কত দীর্ঘ, কত বড়ই না তার হইবে।

যদি বলেন, ইহা পরমাণু নহে; তাহার ইহা হইতেও সূক্ষ্মাবস্থা আছে। গণিত অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য কিছুই নাই। রেখা গণিত স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে এমন অবস্থা হইতে পারে না, যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর আকৃতি সম্ভব নহে।

যথা;—কখ রেখার অন্তরস্থ গ বিন্দু হইতে গঘ লম্ব উত্তোলন করি,

গঘ রেখারে ঘ প্রান্তে অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট করিয়া লই। পরে ঘ এক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ঘগকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া গচছ বৃত্ত অঙ্কিত করি। কখ রেখার কগ অংশে ঝ এক বিন্দু লই। ঘঝ যোগ করি। ঘঝ রেখা চ বিন্দুতে গচছ বৃত্ত অবচ্ছেদ করিবে। পুনশ্চ গঘ হইতে বৃহত্তর গজ রেখা লই এবং জ কেন্দ্র করিয়া ও জগ কে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এক বৃত্ত অঙ্কিত করি। তাহার পরিধি অবশ্য অবশ্য ঘঝ রেখার চঝ অংশকে কোনও এক বিন্দুতে অবচ্ছেদ করিবে। (যেহেতু উভয় বৃত্ত এক বিন্দুতে স্পর্শ করিলেও পরিধি ও সরল রেখা একই বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে।) অতএব কখ রেখা ও প্রথম বৃত্তের পরিধির অন্তর্গত যে বিন্দুতে শেষোক্ত বৃত্তের পরিধি ঘঝ রেখা কে অবচ্ছেদ করিতেছে, তাহাকেও চ' মানিয়া লই। সুতরাং প্রথম চঝ হইতে দ্বিতীয় চঝ লঘুতর।
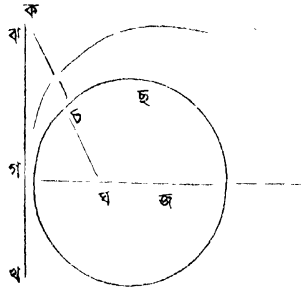
যদি জ বিন্দুকে ঙ প্রান্তের দিকে ক্রমে সরাইয়া জগ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিতে থাকি, তাহা হইতে ঝচ রেখা ক্রমে লঘু হইতে লঘুতর হইতে থাকিবে। কিন্তু, এমন ক্ষুদ্র কখন হইবে, যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর আর হইতে পারিবেনা? গঘ রেখা ঘ (ঙ) প্রান্তে অসীম অনন্তদূর বিস্তৃত স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং জ বিন্দুকে সরাইতে সরাইতে এমন অবস্থা কখনই আসিতে পারেনা, যাহার পর জ বিন্দুকে সরাইতে আর স্থান পাওয়া যাইবেনা গ প্রান্তে কখ রেখা বৃত্তের স্পর্শরেখা (Tangent); অতএব কোন ও বৃত্তের পরিধিই ইহাকে অবচ্ছেদ করিতে পারিবে না, অথবা ইহার সহিত মিলিতে পারেনা। এমন কি ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট অন্য কোন পরিধিও অবচ্ছেদ করিতে বা তাহার সহিত মিলিতে পারে না। অতএব চঝ রেখা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ঝ বিন্দুকে ঘঙ র দিকে ক্রমে সরাইয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে লঘু হইতেও লঘুতর অবচ্ছিন্ন হইতে থাকিবে।

যাঁহারা ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এই উদাহরণ হইতে বিশদভাবে দেখিলেন যে, পদার্থ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, পরন্তু তাহা হইতেও ক্ষুদ্রতর অবস্থা সম্ভব।

অতএব রেখা গণিত যে পদার্থের অস্তিত্ব বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত করিতেছে, তাহ স্বীকার করা কি অসম্ভব স্বীকার নহে? (জয়ধ্বনি)

অন্য শত শত যুক্তি বলেও পরমাণুবাদ খণ্ডন করা যাইতে পারে, কিন্তু আমার শ্রোতৃবর্গ অধিকাংশই স্কুলকলেজের বিদ্বান দেখিতেছি, অতএব তাঁহাদিগকে বুঝাইতে এইরূপ আর একটী উদাহরণই পর্য্যাপ্ত হইবে মনে করি।

অঙ্ক গণিতে কোন বাক্ত রাশি হইতে দেখুন—১ একক সংখ্যাকে ২ দুই আদি ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ক্রমে হ্রস্ব হইতে চলিবে, কিন্তু কখনও শূন্যে পরিণত হইবে কি ? ($\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৫}$, $\frac{১}{৬}$, $\frac{১}{৯৯৯৯৯৯}$, ইত্যাদি), কখনও নহে। হাঁ,উহা ক্রমে লঘু হইতে লঘুতর এবং তাহা হইতেও লঘুতর হইতে থাকিবে কিন্তু একেবারে শেষ হইবে না। যদি কেহ বলেন, 'কেন শূন্য দ্বারা ভাগ করিলে শূন্য হইবে।' তবে ইহা হইতে মুর্খতার কথা আর কি আছে। যেহেতু ভাগ করা অর্থ এই যে, কোন রাশি হইতে অপর কোন রাশি যত বার সম্ভব বিয়োগ করা। একক হইতে বারংবার শূন্য অন্তর করিলে এককের কিছুই কমিবে না বা বাড়িবে না। তবে ইহা কি রূপে সম্ভব যে, একককে শূন্য দ্বারা বিভাগ করিলে (১ ÷ ০) একেবারে শূন্য মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে ?

কোন তর্কবাগীশ হয় ত বলিবেন, অনন্ত সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে শূন্য ফল হইবে। ১ ÷ .........Infinity)। কিন্তু দেখুন, ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা দ্বারা বিভাগ করিয়া ভাগফল ক্রমে ক্ষুদ্র হইতেছিল। অতএব অনন্ত বড় সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে অনন্ত ক্ষুদ্র ভাগফল হইবে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে না। এ যুক্তিবলেও পরমাণুর সত্তা বা পরিমাণ সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব তাহা স্বীকার করা কি অসম্ভব স্বীকার নহে ?

দ্বিতীয়তঃ—প্রকৃতি বিজ্ঞান বলিতেছে, জগতের সকল পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিতেছে। বলুন ত একথাটী কতদূর মনের মত, সম্ভবপর ও ধারণাযোগ্য হইতে পারে ? আপনারা কোনও পদার্থকে একই সময়ে টানিয়া এবং ঠেলিয়া একবার বরাদ্দ বুঝুন ত, ইহার এ অর্থ নহে, যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিবেন এবং ইহাও নহে যে, এক অংশে আকর্ষণ করিবেন এবং অপরাংশে দূরসঞ্চালন করিবেন। কিন্তু একই সময়ে কোন পদার্থকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ দুই পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া আবশ্যক। বস্তু বিদ্যায় এরূপ অসম্ভব কথা কেন স্বীকার করা হইয়াছে ?

(২) জ্যামিতিবিদেরা একবার ত্রিকোণমিতিবেত্তাদের কথা মনোযোগসহ শ্রবণ করুন। তাঁহারা বলেন, সমান্তরাল রেখাও কখন কখন মিলিত হয়। ইহাকে কি আপনারা অসম্ভব স্বীকার বলিবেন না?

দেখুন যে রেখা গণিতের উপর ত্রিকোণমিতির ভিত্তি স্থাপিত, তাহারই বিচারে একথা অসম্ভব প্রমাণিত হইতেছে।

(২।ক) সমান্তরাল রেখার সংজ্ঞা এই—"যে যে সরলরেখা একই সমধরাতলে অবস্থিত এবং উভয় পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি পাইলেও পরস্পর সংস্পর্শ করে না, তাহাদিগকে সমান্তরাল সরল রেখা বলে।" কিন্তু আপনি বলিতেছেন যে, সমান্তরাল রেখাও অবিশ্রান্ত বর্দ্ধিত হইলে মিলিত হইবে। সুতরাং ইহা অসম্ভব।

(২।খ) দুই সমান্তরাল সরল রেখা এক দিকে ক্রমবর্দ্ধিত হইলে যদি মিলিত হয়। তাহা হইলে অপর প্রান্তেও ক্রমবর্দ্ধিত হইলে মিলিত হইবে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে,দুই সরল রেখায় ক্ষেত্র পরিবেষ্টন করিতেছে। পক্ষান্তরে রেখা গণিতের ১০ম স্বতঃসিদ্ধ বলিতেছে, "দুই সরল রেখায় কোন ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।" ইহা কি অসম্ভব নহে?

(২।গ) যদি দুই সমান্তরাল রেখার কোন একটীতে এক বিন্দু লই এবং তাহা হইতে এক লম্ব উত্তোলন করিয়া অপর রেখা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করি, তাহা হইলে এক ত্রিভুজ অঙ্কিত হইবে, যাহার দুই বাহু সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের অংশ ও অপর বাহু লম্ব রেখা। এই ত্রিভুজের দুই কোণ দুই সমকোণ; কিন্তু তাহা অসম্ভব (১।১৭ প্রতি)। এই ত্রিভুজের ৩ তিন কোণ দুই সমকোণের অধিক হইতেছে, কিন্তু তাহা ও অসম্ভব (১।৩২ প্রতিজ্ঞা)।

(২।ঘ) যদি বলেন, দুই সমান্তরাল রেখা মিলিবে, কিন্তু পরস্পরের অন্তঃর্গত কোন কোণ উৎপন্ন করিবে না। তথাপি উভয়ে মিলিয়া অবশ্য এক রেখা হইবে, এবং উভয় সমান্তরাল মিলিয়া এক রেখাও লম্ব এই দুই সরল রেখা এক ক্ষেত্র পরিবেষ্টন করিবে; ইহা অসম্ভব। ইত্যাদি শত শত উপায়েও ইহা অসম্ভব। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, যে সেই কলেজের বালকদিগের এ মহা অসম্ভব বাক্য স্বীকার করিতে মনে খট্‌কা লাগে না; পরন্তু জগৎপিতা জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান মহামহিম পরমাত্মার গুণব্যাখ্যা করিতে যদি কোন কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাদের বক্ষে দারুণ শেল বিদ্ধ হয়।

(৩) অঙ্ক গণিতে আরও দেখুন। সংস্কৃত গণিতবিদেরা এ বিষয়ে যুক্তি বলে পার পাইতে পারেন, কিন্তু আজকালিকার নবীন গণিতজ্ঞেরা নব নব পথই অনুসরণ করেন। ১ কে শূন্য দ্বারা বিভাগ করিলে লব্ধফল কি হইবে? সংস্কৃত গণিতজ্ঞেরা বলিবেন, ভগ্নাংস (১/০) ই লব্ধফল হইবে। যদি এ বিষয়ে আরও কিছু কড়া কড় করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় ত অনির্ব্বাচ্য বাদ্যের কাছা-কাছি পৌছিবেন। পক্ষান্তবে নবীন গণিতজ্ঞেরা বলিবেন, কোন রাশিকে ভাগকরিলে ভাজক যতই ছোট হইবে, ভাগফল ততই বড় হইতে থাকিবে। (যথা,—১০০ ÷ ৫০ = ২ ; ১০০ ÷ ২৫ = ৪ , ১০০ ÷ ১০ = ১০ ; ১০০ ÷ ২ = ৫০; ১০০ ÷ ১ = ১০০, ১০০ ÷ ½ = ২০০ ইত্যাদি) এই রূপে ভাজককে কমাইতে কমাইতে যদি অতি লঘু অর্থাৎ শূন্যে পরিণত করা যায়, ভাগফলও বাড়িতে বাড়িতে অতি বৃহৎ অর্থাৎ অনন্তরাশি (Infinity) হইবে। সুতরাং ১ ÷ ০ = ০০০ অনন্ত সিদ্ধ হইতেছে। (বঙ্গ দেশের কোন কোন নবীন গণক ১ ÷ ০ = ০ বলিতেছেন!!)

পুনারায় দেখুন, ভাজ্য ১, ২, ৩, ৪ যাহাই হউক না কেন, কিন্তু ভাজক ও লব্ধের গুণফল ভাজ্যের সমান হইবে। অতএব, ০ × ০০০০ অনন্ত = ১ এবং ০ × ০০০০ অনন্ত = ২ হইবে। সুতরাং ১ = ২ ও বলিতে হইবে, যাহা নিতান্তই অসম্ভব।

কোন কোন গভীর গণিত-শাস্ত্রবেত্তা ইহার এমনও উত্তর দেন, যে সকল শূন্য সমান নহে এবং সকল অনন্ত রাশিও তুল্য নহে, এজন্য উপরোক্ত সমীকরণ (১ = ২ ঠিক নহে এবং অসম্ভবও নহে। কিন্তু এ কি রকম কথা। এত ঐ কথাই হইল যে,"মদ গাঁজার শ্রাদ্ধ ক'রে, তামাকের বেলা যত দোষ"। (গুড়খায় গুলগুলেকী পরহেজ)। শূন্য অর্থ কিছুই না। কিন্তু কিছুই না কিছুই নাও যদি লক্ষ রকমের এবং অনন্ত অনন্তও যদি কোটি রকমের মানিতে হয়, তবে যে দেখি অসম্ভব ব্যাপার। আরও আশ্চার্য্যের কথা এই যে, আমাদের ইংরাজী নবিশ মহাশয়েরা এ সকল কথা চট করিয়া বুঝিতে পারেন, কিন্তু, ভগবানের নাম করিতে এবং তাঁহার উপাসনার বেলাই যত আশঙ্কা—যত সন্দেহ ও যত যুক্তির অবতারণা। (জয়ধ্বনি)।

এ প্রসঙ্গ আর অধিক বিস্তারিত করা উচিত মনে করি না। আপনারা এই রূপে বীজগণিতেও দেখিবেন, যাঁহারা অসমান রাশিতে সর্ব্বাধিক সংখ্যা করিয়া অন্তরান্তর করিলে সমান ফল স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে

অসমান রাশি সমান প্রমাণিত হয় কি না ? এ বিষয়ের কথাও আপনারা প্রণিধান করিবেন, যে পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ, বজ্রবৎ কঠিন অসম্ভব বিষয়ও লোকে অনায়াসে পার হইতেছে, কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে কোনও এক কথা বুঝিতে না পারিলেই তাহাদের পেটে উলট পালট খিচুরী সিদ্ধ হইতে থাকে। ( বিশেষ জয়ধ্বনি, করতালি বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি )

(ট) উল্লিখিত যুক্তি শুনিয়াও যদি কেহ আপনার একগুয়ামি জাহির করিয়া বলেন, "যাহাই হউক না কেন, সর্ব্বব্যাপকের আকার কল্পনা আমার চিত্তে কিছুতেই লাগিতেছে না।" এমন পাষাণ হৃদয়কে বুঝাইতে যাওয়ার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ব্বে কয়েক বার আপনাদের নিকট বিশদ রূপে প্রকাশ করিয়াছি যে, অন্য মতাবলম্বী ভিন্ন ধর্ম্মের কাহাকেও বলিয়া কহিয়া আপন মতে আনয়ন করা আমি মহাপাপ বিবেচনা করি। যেহেতু ইহা সনাতন ধর্ম্মের উদারতা বহির্ভূত কার্য্য। কিন্তু হাঁ, আমাদেরই বালকেরা কুসংসর্গে পড়িয়া, কুশিক্ষা পাইয়া, মতি গতি বিগড়িয়া বিপথগামী হইলে তাহাদিগকে বাপু, ভাই, সোনা, যাদু বলিয়া, বুঝাইয়া কহিয়া, সন্দেহ ভঞ্জন করা এবং সৎপথে পুনরায় আনয়ন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহার নাম পুত্র, অর্থাৎ যে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিবে, যাহাকে দর্শন মাত্র পিতা মাতা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন, যে ইহ কালে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পরম সুখী করিবে এবং জীবনান্তেও শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা পরলোকে সুখ শান্তি বিধান করিবে, সেই বালক পিতা-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষদিগকে মূর্খ বলিতেছে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে ধ্বজা উড়াইতেছে এবং আপন আপন অভীষ্টদেব রামকৃষ্ণের পর্য্যন্ত নিন্দাবাদ ঘোষণা করিয়া বদন কলুষিত করিতেছে। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার হৃদয় জ্বলিয়া ছার খার হইতেছে, তাঁহাদের দুনয়নে ধারা বহিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছে, তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কাহার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে ? সুতরাং অর্থব্যয় করিয়া এবং শ্রম স্বীকার করিয়াও যতদুর সাধ্য ইহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে যত্ন করা যাইতেছে। পতঙ্গকে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া আমরা বহু চেষ্টা করি, যাহাতে সে আগুনে প্রবেশ করিতে না পারে। তথাপি যদি সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আগুনেই পুড়িয়া মরে, আমাদের দোষ কি ? এই নব্য বাবুদের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা যে খলতা ও কপটতা ত্যাগ করিয়া, তর্ক-বুদ্ধি ও চঞ্চলতা পরিহার করিয়া

আগ্রহ ও জিজ্ঞাসার সহিত শ্রবণ করিবেন। সত্যসত্যই সন্দেহ মিটিয়া যাইবে এবং আমার কথা মনে লাগিলে তাহা স্বীকার করিবেন। নতুবা যথাভিরুচি উপরি টপ্পার ফক্করি করিতে থাকুন। তাহাদের এমনি চট্‌পটে ক্ষুর ধার বিদ্যা বুদ্ধি যে, কোরাণ হাতে করিলেই ইসলামকে সেলাম করিতে থাকে, বাইবেল ছুঁইলেই ঈশামূশার স্তুতি জয় জিহ্বায় আওড়াইতে থাকে। ব্রহ্ম-জ্ঞানীদের ভ্রমে পড়িলেই বেহ্ম বেহ্ম ভোঁমাইতে থাকে। অনার্য্য আর্য্য-সমাজের কার্য্য কলাপে মিশিলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আচার্য্যপ্রবরদিগের প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু, বাপু সকল "সূর শ্যাম কীকালী-কমরিয়ো চঢ়ৈ ন দূজোরং।" হাজার বল, কৃষ্ণের শ্যামরূপ কিছুতেই ঘুচিবে না।

যাউক, আমরা মূল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার দেখা যাউক, কত প্রকার পদার্থের আকার কল্পনা হইতে পারে না। আমার বিবেচনায় আপনারা নিপুণ হইয়া বেশ ভাল করি চিন্তা করিলেও পাঁচ প্রকারের অধিক পাইবেন না। শুনিয়া মিলাইয়া দেখুন, এই পাঁচটী হয় কি না—

(১) প্রথমতঃ—অনন্ত ( সর্ব্বব্যাপক ) পদার্থের আকার কল্পনা দুরূহ।

(২) দ্বিতীয়তঃ—অতি সূক্ষ্ম পরমাণু স্বরূপের আকার হইতে পারে না।

(৪) তৃতীয়তঃ—যাহার তত্ত্ব অবিদিত,তাহার আকার কল্পনা করা অসাধ্য।

(৪) চতুর্থতঃ—যাহার বিষয় নিশ্চয় জানি নিরাকার, তাহার আকার চিন্তা করা অসম্ভব।

(৫) পঞ্চমতঃ—যে পদার্থ কিছুই নয়, সেই শূন্য স্বরূপের আকার কি হইবে ?

বলুন, ইহা ব্যতীত আর কি কোন ও পদার্থ এমন আছে, যাহার আকার প্রশ্নকর্ত্তার ধারণায় আসে না ? ( না, না, খুব ঠিক হয়েচে )। আচ্ছা এখন আমার যুক্তি শুনুন। আমি বলিতেছি, যদি আকার কল্পনাই স্থির হয়, তবে এ পাঁচ প্রকার পদার্থেরও আকার কল্পনা সম্ভব। ক্রমে বিবৃত হইতেছে—

(১) প্রথম প্রশ্ন হইয়াছে, অনন্ত পদার্থের আকৃতি স্বীকার করা যাইতে পারে না। হাঁ স্থূল দৃষ্টিতে সকলেই বুঝিতে পারেন আকৃতি হইবে, অবচ্ছিন্ন পদার্থের কিন্তু সর্ব্বব্যাপক নিরবচ্ছিন্নের আবার আকৃতি কি ? কিন্তু গম্ভীর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখুন। প্রথমে ফলিত গণিতশাস্ত্রেই বিচার

করা যাউক। কোন প্রধান কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপক দুই হাত পরিমাণ মাত্র এক কাল বোর্ডের উপর চা খড়ি দ্বারা এক রেখা টানিয়া বলিবেন ( A B is a straight line drawn in both sides to infinity ) ক খ এক সরল রেখা অঙ্কিত হইল,ইহার উভয় প্রান্ত অসীম, অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বলুন, ইহা অনন্তের আকার কিরূপে হইল ? পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অসীম রেখা কোটি যোজনেও শেষ হয় না; কিন্তু এই হাত দুই এক তক্তায়ই তাহার কুলান হইয়া গেল !

অঙ্ক গণিতে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোনও সংখ্যা বা রাশিকে ০ শূন্য দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল কি হইবে ? অমনি আমাদের নব্য বাবু পণ্ডিতেরা দুই অঙ্গুল এক টুকুরা কাগজে ( ১ ÷ ০ = ... ) সংখ্যা লিখিয়া ভাগ চিহ্ন রাখিবেন এবং শূন্যের পরে সমান চিহ্ন বসাইয়া গোটাদুইচার বিন্দু লিখিয়া বলিবেন, এই দেখুন, অনন্ত রাশি (infinity) ভাগফল হইল !!

বলুনত অনন্ত রাশি কি রূপে লেখা হইল ? অনন্ত রাশিকে কি কেহ হংস পংক্তিতে উড়িতে দেখিয়াছে ? তবুও তাহার আকার কল্পনা হইয়া গেল। কিন্তু যাঁহার আকার কল্পনায় পূজা অর্চ্চনা হইতে পারে এবং মানব সংসার পারাবার পার হইতে পারে, তাঁহার আকার কল্পনা করিতে দেখিলে লোকের কি মাথা ব্যথা হয় ? ২২.৬।১২

(২) দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে অতি সূক্ষ্মের আকার সম্ভব নহে। হাঁ সত্য বটে স্থূল বুদ্ধিতে সকলেই একবার মনে করিবেন, যাহার দৈর্ঘ্য নাই ও বিস্তার নাই, যাহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম,তাহার চেহারা কি হইবে ? সুতরাং তাহা অঙ্কিতই বা হইবে কি প্রকারে ! কলেজের বি, এ, এম্, এ, ক্লাশে যাহা ঘটিয়া থাকে লিখিতেছি। এণ্ট্রান্সের ফোর্থ ক্লাশ হইতে চর্ব্বিত চর্ব্বন করা হইয়াছে যে "যাহার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তার নাই তাহাকে রেখা কহে" "যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই তাহাকে বিন্দু বলে।" ইহা পুনঃ পুনঃ মনে করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পরন্তু কোন এক প্রকাণ্ড সমালোচক ( Critic ) প্রফেসর সাহেব এক বোর্ডের উপর এক টুকরা চা খড়ি হাতে লইয়া লম্বা চৌড়া মস্ত এক রেখা টানিয়া এবং স্পষ্ট এক ফোটা দিয়া বলিবেন "দেখ, ক খ এক নির্দ্দিষ্ট রেখা এবং গ এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দু" ( You see, A B is a straight line and C is a point &)। আমি বোধ করি, আমার প্রশ্নকর্তার ন্যায় নব্যশিক্ষিত গজগজবুদ্ধি

মহামহোপাধ্যায় বিদ্যা-দিগ্‌গজদের চট্‌ পট্‌ খাড়া হইয়া বলা উচিত "বেশ মহাশয়, বিন্দু এমন ক্ষুদ্র হইবে যাহার দৈর্ঘ্যও নাই বিস্তারও নাই, কিন্তু ঐ চারি ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট শ্বেতগোলক কি বিন্দু হইল! আর ঐ তাল গাছের ন্যায় মোটা, দুধের ন্যায় সাদা প্রকাণ্ড হ্যারিসন রোড্‌ ( Harrison Road ) কি রেখা হইল? যদি প্রফেসর সাহেব উত্তর করেন, "না বাপু, খড়ি মাটী ( chalk ) মোটা বলিয়া রেখা মোটা হইয়াছে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, মনে করিয়া নেও ইহাই বিস্তার শূন্য রেখা।" ইহাতেও যদি টাস করিয়া জবাব দেও "না মহাশয়, মানা না মানার কোন কথা নাই, ঠিক রেখাই টানুন।" তাহা হইলে মাননীয় প্রফেসর মহাশয় ( Respected sir ) নিরুপায় হইয়া বলিবেন "বাবু, রেখা ও বিন্দুর যে লক্ষণ আছে, ঠিক সেই রকমটী বানাইতে মানুষের সাধ্য নাই। যদি তা'র জন্যই তোমার জেদ হ'য়ে থাকে ত চুপ ক'রে ব'সে থাকো, লেখা পড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু যদি মানিয়া মানিয়া শিখিতে চলো, তবে এসব গণিতের ফল ত্রিকোণমিতি বুঝিতে পারিবে, তাহার ফলগ্রহ হইলে দূরতা আদি জ্ঞান লাভ হইবে। নচেৎ আপন জেদের ও তর্কের কোটে—গোবর গণেশ হইয়া থাকিবে। রেখা টানিতে দিবে না, বিন্দু বসাইতে দিবে না, ত যেমন আছ, তেমন গোয়ারগোবিন্দ গর্দ্দভ চন্দ্রই রহিয়া যাইবে, জ্ঞানের সহিত কোনও সম্পর্ক হইবে না।"

বেশ, এইরূপে ইহা বুঝিয়া নিতে হইবে "অণোরণীয়ান্‌" মহাপ্রভুর যথার্থ স্বরূপ আমরা ধারণা করিতে না পারিলেই বা চিন্তা কি? পরন্তু এই রূপ কূট তর্কের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌লে যেমন তেমনটীই নিরেট মূর্খ অবিশ্বাসী হইয়া থাকিব। এবং সেই জন্মমৃত্যু, সেই সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন ও ভবযন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া রহিবে। কিন্তু, যথাসাধ্য কল্পনার সাহায্যে ধ্যান-ধারণা ও উপাসনা অভ্যাস করিতে থাকিলে কোনও দিন অবশ্যই ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে।

(৩) তারপর বলিতেছেন "অজ্ঞাত পদার্থের আকার কল্পনা হইতে পারে না।" মরি, মরি, তবেত দেখি বীজগণিত একেবারেই ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তাহাতে অজ্ঞাত পদার্থ ( রাশি সংখ্যা, unknown quantity) স্বীকার করা হইয়াছে,কাগজে লেখা হইয়াছে, তাহার যোগ বিয়োগগুণনাদি ক্রিয়া করা যাইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে অজ্ঞাত হইতে জ্ঞাতও

আসিয়া পড়িতেছে। অতএব হে প্রিয় মহাশয়গণ, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, সেই "মনসো বচসোঽপ্যগোচরঃ" বিষয়েও যাহা কিছু শ্বেতপীত মানিয়া লইয়া তাহার উপাসনার গণিত করিতে চলো, এক দিন না এক দিন ফল প্রাপ্তি হইবেই হইবে। (জয়ধ্বনি)

(৪) এখন বোধ করি, চতুর্থ প্রসঙ্গ আপনাদের ওষ্ঠাগ্রে ভাসিতেছে, তাহা এই "যাহা নিরাকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহার আকার কল্পনা করা যাইতে পারে না।"

যদিও পরমাত্মা সম্বন্ধে এমন কিছু স্থির নিশ্চিত বলিতে পারি না, তথাপি আপনাদের যুক্তি সমালোচনা করিতে হইবে।

আমরা যে শব্দ শুনিতে পাই, তাহা রূপরহিত ইহা সকলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং রূপহীন অতএব নিরাকার ইহাও নিশ্চিত।

ভাল, এখন সত্য বলুন ত আপনারা কখনও কি ক, খ, গ, ঘ (নামক কোন পদার্থ বা জীব) আকাশে উড়িতে বা কোন বৃক্ষে ঝুলিতে দেখিয়াছেন? কোথাও আলিফ্, বে, পে, তে কোঁচার খোটে ঢুলিতে অথবা এ, বি, সি, ডি জলে বুদ্ বুদ্ করিতে দেখিয়াছেন কি? অথবা কোথায়ও কীট পোকার সহিত মাকড়সার জালে আলফা, বিটা দেখিয়াছেন কি? অথবা পড়িবার সময় অক্ষরের একাবেকা চেহারা দাঁতে খট্ করিয়া বাজিয়া উঠে কি? কিংবা পড়িতে পড়িতে মুখ হইতে কালা কালা অক্ষর পংক্তির ধারা ছুটিতে থাকে কি? (করতালি)। কখনই নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনারা উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্বান চূড়ামণি হইয়াও চট্ ক'রে কাগজের উপর কালা কালা আকার লিখিয়া বলেন এটী 'ক' এটী 'খ'।

অসভ্য সাঁওতাল জঙ্গলী বেচারারাও আপনাদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তাহারা আজ পর্য্যন্তও পাপ বর্ণমালা লিখিয়া নিরাকারের আকার কল্পনা দ্বারা হৃদয় কলঙ্কিত করে নাই।

হয়ত বলিবেন "যদি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে আমাদের অভিপ্রায় ও মনেরভাব দূরদেশবাসী ও উত্তর কালীন লোকেরা কেমন করিয়া বুঝিবে? আমরা যদি গ্রন্থ পাঠ ও সংকলন করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের বাক্‌শক্তি থাকিয়াই বা লাভ কি? এতদূর বুঝিতে পারেনা বলিয়াইত সাঁওতাল অসভ্য জঙ্গলী।" বেশ, মাপ করিবেন, আমিও বলিব, যদি পরমাত্মার আকার কল্পনা না করি, তাহা

হইলে তাঁহার উপাসনা কিরূপে করিব? ভক্তির উদ্রেক কেমনে হইবে? আপনার বাক্‌শক্তি ব্যর্থ হইতেছিল, এ যে মনুষ্য জীবনই বৃথা হইতেছে!! আপনি যদি এতটুকুও না বুঝিতে পারেন, তবে আমি আপনার যুক্তিতেই আপনাকে অসভ্য জঙ্গলী সিদ্ধ করিতেছি!

(৫) আপনাদের ৫ম আপত্তি হইতেছে "যে পদার্থ কিছুই নহে—কেবল শূন্য, তাহার আকার কিরূপ হইবে?" আমি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না। মনে করুন, আপনার থলিতে পাঁচ টাকা আছে এবং আপনি এক দিন তাহা হইতে ২্ টাকা ও অন্য একদিন ৩্ টাকা খরচ করিলেন। বলুনত এখন থলিতে হাত দিলে কি কিছু পাওয়া যাইবে? (না না, কিছুই না) ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন অতি বড় চতুরের হাতেও কি কিছু লাগিবে? (না না)। দেখুন ত গোল গোল রসগোল্লার মত কিছু আছে কি না! (হাস্য ও করতালি)

আপনাদের L. L. D. বিদ্বানের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, পাচ হইতে ২ ও ৩ বাদ দিলে কত অবশিষ্ট থাকে, তিনি তাড়াতাড়ি একটী গোলাকার লিখিয়া বলিবেন এই রহিল [৫—(২+৩) ॥ ০]।

বিচার করিয়া বলুন, আপনাদের শূন্য গোল হইতে পারিল, আর পরমাত্মা শালগ্রামশিলা বা নর্ম্মদেশ্বর রূপ হইতে পারেন না?

অনেক খণ্ডন মুণ্ডনের পর স্থূলতঃ স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, আপনারা প্রথমে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তিনি সেরূপ নিরাকার নহেন। আকার কল্পনায় কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না। নিরাকার পদার্থের আকার কল্পনা আপনারাও করিয়া আসিতেছেন। অতএব যখন সকল পদার্থেরই প্রতিনিধি স্বরূপ আকার স্বীকার করা যাইতে পারে, তখন যাঁহার আকার মানিয়া উপাসনা করিলে আমাদের মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইবে বিশ্বাস করি, তাঁহার মূর্ত্তি কেন স্বীকার করিব না?

অতঃপর তৃতীয় প্রশ্ন—

(৩) "ব্যাপকতা বুঝিয়া মূর্ত্তিপূজা করিলে কোন বিশেষ বিশেষ পদার্থের পূজা করা হয় কেন?"

এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিলেন কি? এত সভ্যতার সহিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু আজ কালিকার সৎকুলসম্ভূত কোনও কোনও বালক এমন ভাবেও প্রশ্ন করিয়া থাকেন,—"যদি ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, তবে

শুধু শালগ্রাম, নর্ম্মদেশ্বর ও রামকৃষ্ণাদি বিগ্রহেরই কেন উপাসনা করা হয়? ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি সকল স্থানেই পূজা করা হয় না কেন? আমি যদি কোন নিকৃষ্ট স্থান দেখাইয়া দেই, তাহারই বা পূজা হইবে না কেন?" আপনাদের হয়ত বোধগম্য হইয়াছে, প্রশ্নকর্ত্তা মনে করিয়াছেন যে, (ক) আমরা কেবল ব্যাপকতার জন্যই মূর্ত্তিপূজা করি। (খ) এবং প্রধান প্রধান মূর্ত্তি ব্যতীত অপর স্থানে আমরা পূজা করি না। (গ) পরন্তু যেন তাঁহারা কখনও ব্যাপকের ব্যাপ্যাংশে পূজা উপাসনা করেন না। আপনারা ইহার সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা প্রশ্নকর্ত্তার পেটে অতিমাত্রা চতুরতা-নিবন্ধন অজীর্ণহেতু প্রলাপোদ্গার মাত্র। ইহাকে প্রশ্ন বলা যাইতে পারে না।

(ক) ইহা কে কবে বলিয়াছে যে, পরমাত্মা ব্যাপক, কেবল এই জন্যই আমরা মূর্ত্তিপূজা করি? পরন্তু যাহাতে চিত্ত স্থির ও ভগবন্ময় হয়, শান্তি লাভ হয়, শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি আরো অনেক কারণ আছে, তজ্জন্য আমাদের মূর্ত্তিপূজা আবশ্যক। অধিকারী ভেদ ও অর্চ্চনাপদ্ধতি ভেদদ্বারা ইহা নিশ্চিত উপলব্ধি হয় যে, কোন বিশেষ বিশেষ রূপ, আকার, বর্ণ, গঠন ও প্রণালী বিশেষ বিশেষ শক্তির পরিচায়ক ও প্রকাশক। ইহার সবিশেষ তত্ত্ব ৬ষ্ঠ প্রশ্নের আলোচনায় আপনাদের বিদিত হইবে। এখানে এই টুকু মাত্র জানিয়া লউন যে, শুধু ব্যাপকতা আমাদের মূর্ত্তি পূজার কারণ নহে। পক্ষান্তরে ইহা বলা উচিত যে, ব্যাপকতা মূর্ত্তি পূজার কারণই নহে। যেহেতু আমরা ইন্দ্রাদি দেবতা, নন্দ-যশোদা বসুদেব-দেবকী ও হিমালয় বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি সকলেরই মূর্ত্তি গড়াই এবং শ্রাদ্ধ তর্পণে পিতৃপুরুষের ও পুত্তলিকায় যাহা কিছুর মূর্ত্তি কল্পনা করি, তাহাতে ব্যাপকতার ভাব কিছু-মাত্র থাকে না।

(খ) তাহাদের বিশ্বাস, আমরা মূর্ত্তি ভিন্ন অপর কিছুরই আরাধনা করি না। ভাল, ভাল, বলিহারি যাই তোমাদের বুদ্ধির! তোমাদের মস্তিষ্কের আগুনে বজ্রও ঝলসিয়া যায়। তোমরা সপ্তাহে এক দিন দশ পনের জন সহযোগী একত্র হইয়া প্রার্থনা আওড়াইয়া লও, তাহাতেই সর্ব্ব ব্যাপকের উপাসনা হয়, কিন্তু আমরা উপাসনাপদ্ধতি ও পূজাশাস্ত্র অনুসারে নারদশাণ্ডিল্যাদিআচার্যাপরম্পরাপন্থানুসরণে আরাধনা করি, তাহা কিছুই নহে। আমরা কাহার না পূজা করি? আমাদের পূজা-প্রণালীতে কাহার

পূজা বাদ পড়ে ? আমরা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রের উপাসনা করি, ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতের অর্চ্চনা করি। আমরা নদ, নদী, সাগর, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়েরও পূজা করি; হিম, বিন্ধ্য, গোবর্দ্ধন, চিত্রকূটাদি পর্ব্বতেরও আরাধনা করি। আমরা বট, পিপ্পল, কদম্ব, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষের উপাসনা করি, সর্পাদি সরীসৃপেরও পূজা করি। শয্যাদানে ও লক্ষ্মী পূজার প্রণালীতে পালঙ্ক, তোষক, ছড়ী, ছত্র, শয্যা, বেশ ভূষারও পূজা করা হয়; বাস্তু পূজায় গৃহ-দেবের উপাসনা হয়। শ্রীপঞ্চমীর দোয়াত, কলম, পুঁথি পত্রের অর্চ্চনা ভারত-প্রসিদ্ধ। বলিতে কি, আমরা দশদিকের পূজা করি, তিন লোক চতুর্দ্দশভুবনের আরাধনা করি। এবং আমরা লৌকিকালৌকিক সকল পদার্থের ভিতরে জগন্ময় যে এক অপূর্ব্বশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই শক্তি-রূপিনী ভগবতী মহামায়ারও স্তুতি করি (যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্ বা হখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিং স্তূয়সেতদা)। এখন বলুন, সংসারে কি বাকী রহিল, যাহার আরাধনা হিন্দু করেন না? এমন কোন্ পদার্থের নাম করিবেন, যাহা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল ত্রিলোকের বহির্ভূত? (জয়ধ্বনি) হাঁ, যদি বলেন "ত্রিলোকের মধ্যে আমরাও ত আছি।" তা,বেশত আসুন না, আমার ইহাতে কি আপত্তি আছে। আমি আপনাকে পঞ্চোপ-চারে কেন ষোড়শোপচারে উত্তম মধ্যম পূজা করিতে প্রস্তুত। আমাদের অনন্যবীর বৈষ্ণবগোস্বামী ভক্ততুলসীদাসও বলিয়াছেন, "পুনি বন্দোঁ খল গন সতভায়ে, বন্দোঁ সন্ত অসজ্জন চরনা ম্যাঁ সেবক সচরাচর রূপরাশি ভগবন্ত, সিয়ারামময় সবজগজানী. করোঁ প্রণামজোরি জুগপানী।"

পরন্তু, হে সভ্যগণ, যে মূর্ত্তিদ্বারা আমি ভগবৎ পূজা করি, তাহা হইতে হৃদয়ে কোন প্রকার ঘৃণা আদি কুভাব উদ্রেক হওয়া উচিত নহে। কারণ ঐ সকল ভাব অন্তঃকরণে প্রেম-ভক্তির সম্যক পরিস্ফুরণে বাধা প্রদান করে। এজন্য আমরা ইষ্টদেবের নিন্দুক অথবা অপবিত্র ও মলিন পদা-র্থের উপাসনা করি না। আর্য্য ঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁহাদের উপদেশানু-যায়ী চলিয়া থাকি।

(গ) তারপর মূর্ত্তিপূজার ঘণ্টাধ্বনি শুনিলে যাহাদের শিরোবেদনা উপস্থিত হয়, মূর্ত্তিপূজার শঙ্খনাদ শুনিলে যাহাদের শ্বাসরোধ হয়, প্রতিমাপূজার আরতী দেখিলে যাহাদের হৃদয় জ্বলিয়া যায়, তাঁহাদের কাছেই এক-বার. জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দের উপাসনা কেমন

করিয়া করেন? আপনার প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই, যিনি বহু সম্বন্ধ তাঁহার কোন এক সম্বন্ধে নির্ভর করিয়া উপাসনা করা সঙ্গত নহে। এই নিমিত্ত সর্ব্বব্যাপকের সম্বন্ধ যখন জগৎশুদ্ধ সমস্ত পদার্থের সহিত, তখন কোন এক পদার্থ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা উচিত হয় না। কিন্তু আপন মতটা একবার দেখুন, প্রধান প্রধান মন্ত্র বাছিয়া বাছিয়া কেন জপা হয়। নাস্তিক ব্যতীত যে কোন প্রকার আস্তিকই হউন না কেন—কলমাই বলুন, নমাজই বলুন, প্রাতঃসান্ধ্য প্রার্থনাই বলুন, রসকষহীন 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' শব্দই বলুন, অথবা নব্য বৈদিক তন্ত্রের দয়ানন্দরচিত মন্ত্রই বলুন, আর প্রণবই বলুন, গুণ বিশেষের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয় কেন? যিনি সর্ব্বদিকে বিদ্যমান, তাঁহাকে কি আপনি দশদিকে দশতুণ্ড নোয়াইয়া প্রণাম করেন? যিনি সকল ধর্ম্ম পুস্তকেরই বর্ণনীয়, তাঁহার জন্য কি আপনি বেদ, কোরাণ বাইবেল সকল ধর্ম্মগ্রন্থ একত্র পড়িয়া থাকেন? যিনি সকল ভাষায় গীত হইতেছেন, তাঁহাকে কোন বিশেষ ভাষায় স্তুতি করা হয় কেন? খ্রীষ্টান সাহেব! গির্জ্জাই কি তাঁহার নিকট পৌঁছিবার এক মাত্র দ্বার? আপনি ত বলিতেছেন, God is everywhere মোল্লা মুর্শিদ সাহেব! জুম্মা মস্‌জিদের চূড়া কি ভিশ্‌ত (স্বর্গ) স্পর্শ করিয়াছে? মৃগবৎচঞ্চল আর্য্যসমাজের বালকগণ! তোমাদের সমাজশালা ও যজ্ঞশালার এক পাড়াতেই কি স্বর্গের বাস! ব্রাহ্মসমাজি! ব্রহ্ম মন্দির ছেড়ে তোমাদের ব্রহ্মদেব কি আর কোথায়ও থাকেন না? ছি, ছি, তোমাদিগকেও পরিণামে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই বলিতে হয় যে, সকল ভাষা, সকল গ্রন্থ, সকল দেশ এবং সকল স্থানেই তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু যে যেমন অধিকারী, সে তেমন ভাবেই সাধন করে এবং মানব যখন সর্ব্বব্যাপীর উপাসনা করিবে, তখন কোনও একদেশীয় পদার্থদ্বারাই করিবে। অতএব তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান হইলেও কোনও এক পদার্থদ্বারা ভজনা করিয়া আমরা অবশ্যই তাঁহাকে পাইতে পারিব। অতএব আমাদের উপর এত দম্ভ কড়মড়ি ও মুখভঙ্গী করা কেন?

প্রিয় শ্রোতৃমহাশয়গণ! আপনাদের নিকট তাহাদের এইরূপ হাত-মাথাহীন এলোমেলো যুক্তি লইয়া সময় অতিক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আর্য্য সমাজের এক সভাকে কোনও এক বালক একদা ইহার যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা আপনাদিগকে শুনাইতেছি। ইহাদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইবে, ইহাদের কেমন অসার প্রশ্ন! কোথায়ও এক আর্য্যসমাজী

মড় লম্ফ ঝম্ফ করিয়া গোপে তা দিয়া মাথা নাড়িয়া হাত ঘুরাইয়া কোমর দুলাইয়া বাহাদুরীর সহিত জিজ্ঞাসা করিল "বাহা, বাহা, বাহা, ব-ব-ব-ল-ত যে স-স-সর্ব্বব্যাপক, তাহাকে কোন বিশেষ স্থানে পূ-পূজা করা হয় কেন? আমি যে-যেখানে বলি, সে-সেই খানে কে-কে-ন ফুল চ-চন্দন দেওনা!" উত্তরে বালক বলিল "হাঁ ঠিক, কিন্তু এক কথা, আপনারা পিতামাতার পূজা করেন ও দেবপূজার অর্থ পিতামাতা সেবায় প্রয়োগ করেন এবং "মাতৃদেবোভব", "পিতৃদেবোভব" ইত্যাদি প্রমাণ গ্রহণ করিয়া বাপমার সেবা করা, তাঁহাদিগকে চন্দনে চর্চ্চিত করা, ফুলের মালা পরান, আতর সুগন্ধি দেওয়া প্রভৃতিকে পূজাঙ্গ বিবেচনা করেন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, আপনার পিতাতে পিতৃশক্তি কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত এবং কতটুকু আছে? হাতে, না পায়ে, না আর কোন প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গে? হয়ত বলিবেন, 'না, না, পিতার শরীরময় পিতৃশক্তি ব্যাপ্ত, কোন অঙ্গ বিশেষে বেশী কম নাই।' এই সময় সমাজী মহাশয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা-তা বটে, পিতার দে-দেহময় পি-পিতৃশক্তি সকল স্থানে ত-তু-তুল্যরূপ রহিয়াছে।" তারপর বালক বলিল "কিন্তু দেখিতে ভাই, আপনারা পিতার মস্তকে চন্দন লেপন করেন। যখন পিতার দেহময় পিতৃত্বব্যাপ্ত রহিয়াছে, কেবল মস্তকে চন্দন লাগান হয় কেন? আমি যেখানে বলি, সেই খানে চন্দন লাগাইয়া দিউন।" আর্য্যসমাজী অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় মাথা হেট করিল। ফের লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল "অঁ্যা, মাথা হচ্চে উত্তম অঙ্গ, তাই সেখানেই চ-চন্দন দেই। তু-তুমি কোনও অপবিত্র স্থান বলিলে কি সে-সেই খানেই চন্দন লে-লেপিতে হবে?" বালক বলিল "ঠাকুর মশাই, আমিও সেই সর্ব্বব্যাপকের উত্তম পদার্থেই অর্চ্চনা করি। অপবিত্র নিকৃষ্ট পদার্থে নহে।" তখন আর্য্য সমাজী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সত্যার্থ প্রকাশের পাঁজিপুথি বগলদাবা করিয়া "কি ত-তর্ক কর্ব্বে, ত-তর্ক কর্ব্বে, তবে আমাদের নি-নিয়ম প্রণালী দেখ। ঐ শুড়ীর ওখানে আমি বাসা করেছি, চ-চলে এসো, চলে আও, হ্যাঁ, হুঁঃ" বলিতে বলিতে চম্পট দিলেন। (করতালিধ্বনি)

স্থূলার্থ এই—

(ক) আমরা কেবল ব্যাপকতার জন্যই মূর্ত্তিপূজা করি না। আরও হেতু আছে।

(খ) আমরা কেবল এক জনেরই অর্চ্চনা করি না; পরন্তু অধিকার ও অবসর ভেদে নদী, পর্ব্বত সকলেরই আরাধনা করি। এবং

(গ) তোমাদেরও এ সাধ্য নাই যে ব্যাপকের পূজা ব্যাপকভাবেই করিবে।

এখন চতুর্থ প্রশ্ন।—

(৪) "নিরাকারের উপাসনা ধ্যানাদি দ্বারা সম্ভব হইলে মূর্ত্তির আবশ্যকতা কি!"

এ প্রশ্ন সম্বন্ধে বহু বাক্ বিতণ্ডার প্রয়োজন দেখি না। ইহার কতকাংশ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেই বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। এখন আপনারা বিচার করুন—

(ক) তাঁহার উপাসনা ধ্যানাদিদ্বারা সম্ভব কিনা।

(খ) সম্ভব হইলেও মূর্ত্তি পূজা তাহার সহায়ক না প্রতিবন্ধক।

(গ) যাঁহারা ভগবৎ ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তদ্‌গতা তন্ময় ও তুরীয় ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সমাধি ভঙ্গ করিয়া মূর্ত্তিপূজা করিতে বলি না।

(ক) প্রথমে দেখা যাউক, তাঁহার উপাসনা কেবল ধ্যানাদি দ্বারা সম্ভব কিনা। আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, নির্গুণ, নির্লেপ ও সর্ব্বব্যাপক পদার্থ স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে চিন্তা করা যাইতে পারে কি না। দর্শন এবং শ্রবণ দ্বারা যত প্রকার পদার্থ আমাদের জ্ঞানগোচর বা পরিচিত হইতেছে, সমস্তই আমরা ধারণা করিতে পারি কি না। শারীর-স্থান বিদ্যাবিৎ (ফিজিও-লজিষ্ট) স্পষ্ট বলিতেছেন, মস্তিষ্কের (Brain) কোন অংশেরই সামর্থ্য নাই যে, নির্গুণ ও নির্লেপ কিছুর ধ্যান করে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাই—যত প্রকার বর্ণ আমাদের নয়নপথে পতিত হয় এবং যত প্রকার স্বাদ আমরা আস্বাদন করি, তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক চিন্তা ও কল্পনা করা আমাদের শক্তির অতীত। আমরা ভূবিদ্যায় জানিতে পাই, পৃথিবী গোলাকার, নিয়ত ঘুরিতেছে, সমুদ্র ও মহাদ্বীপে পরিপূর্ণ এবং ২৫০০০ মাইল তাহার পরিধি। কিন্তু একবার চক্ষু মুদিয়া এই সুবৃহৎ পৃথিবীর চেহারা খানা ভাবিয়া নিতে পারেন? যখনই চিন্তা করিতে বসিবেন, ধরিত্রীর কোন ও না কোনও অংশবিশেষমাত্র মনোমধ্যে উদিত হইবে। অথবা অতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভূতলের যতটুকু অংশ দেখা যায়, তাহাই নয়নে ভাসিতে থাকিবে। অথবা অতি দূরে ঘূর্ণমান চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ক্ষুদ্র গোলক স্মৃতির কোণে

বিজুলীচমকে জাগিবে মাত্র। কিন্তু ইহা মনে কিছুতেই ধরিবে না যে, 'আমার চক্ষুর এমনি অলৌকিক শক্তি হইয়াছে যে, ভূগোলকের চারিদিকে একত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই সসাগরা ধরিত্রী সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি গোচর হইতেছে—উহা প্রবল বেগে ঘুরিতেছে, আর আমরা নগরাদির উত্তম শোভা অবলোকন করিতেছি!' বলুনত, সাংসারিক স্বভাববিরুদ্ধ এই সকল ছোট ছোট কথাই যখন আমাদের মনে ধরে না, তখন সর্ব্বথা অলৌকিকের ধ্যান কিরূপে হইতে পারে? যদি "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তাঁহার এই প্রকাশ রূপ মানিয়া ধ্যান করেন, তবে শুক্লাদি কোন ও রূপ মানিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার নির্গুণতা থাকিবে না। ভাল, একবার চক্ষু মুদিয়া দেখুন এবং, শপথ লাগে, সত্য সত্য বলুন, কি দেখা গেল! চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকারের ন্যায় বা ধোঁয়ার ন্যায় কিছু অবশ্যই আসিয়াছে। আর কি দেখিলেন? যদি বলেন, 'সেই অন্ধকারকেই ব্রহ্মস্বরূপ মানিয়া উপাসনা করি। তবে আমাদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয় কেন? আমরাও ত সেই শ্যামরূপ সাগরের অপরূপ সলিলে ডুবিয়া "জয়শ্রীকৃষ্ণ," গাইতেছি। যদি বলেন 'না না আমি ভ্রূসঙ্গমে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বিচিত্র তেজোমণ্ডলে মজিয়াছি,' তাহা হইলে আমি বলিব ও ত কিছুই নহে; কিন্তু যোগমার্গে সেখানে স্থির হইলে ধীরে ধীরে নক্ষত্র মণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডলে শ্যাম বিন্দু এবং অলৌকিক লীলামাধুরী দৃষ্টিগোচর হইবে; যাহা দেখিবার ও দেখাইবার বিষয়, বলিবার ও বুঝাইবার নহে। কিন্তু তাহাতে কি? তাহাতেই কি সর্ব্বব্যাপক নির্লেপের ধ্যান হইল? যদি সেই চন্দ্র-সূর্য্যরূপকে ভগবদ্-রূপ স্বীকার কর, তবে কি সে মূর্ত্তিপূজা হইবে না? আমরা এইরূপ মানসিক মূর্ত্তিপূজায় বিরোধীও ত নই। ফলতঃ সিদ্ধযোগী ও জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিসম্পন্ন পরমহংস ব্যতীত এমন কেহ নাই যে, সেই নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের অনায়াসে ধ্যান করিতে পারিবে।

আজকালিকার ধূর্ত্তকুল চূড়ামণিরা, যাহাদের কেহ কেহ মামলা মকর্দ্দমা লইয়াই ব্যস্ত, কেহ কেহ বা রোজগার ও ধন চিন্তায় ডুবিয়া আছেন, যাহাদের কাণে তবলা, নয়নে অবলা সদাই ভাসিতেছে, যাহাদের হৃদয়ে অহংকার হিমালয়ের ন্যায় মাথা তুলিয়া রহিয়াছে ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদিরার অনবরত উৎস ছুটিতেছে, যাহাদের বিশ্বাস ও চরিত্র কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে, সেই সকল কপট কলঙ্কীরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া

ধা ক'রে নাকমুখ বন্ধ করিয়া এক মিনিটের মধ্যে চিত্ত স্থির করে এবং চক্ষু মুদিয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিয়া লয়। কি আশ্চর্য্য! এই কলিকালে বক এবং বিড়ালেরও ধার্ম্মিক আখ্যা পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কারণ তাহারা ইহাদের অপেক্ষা কিছু অধিক ধ্যানই করিয়া থাকে। একবার নির্গুণ ব্রহ্মের নব্যমতে উপাসনাটা দেখিবেন, তাহা কি প্রহসন ( farce ) চলিতেছে!

আধুনিক নিরাকারোপাসকদের অগ্রগণ্য ব্রাহ্মসমাজীদের ধরণটা একবার আলোচনা করুন। আগেত ইহারা মন্দিরে সঙ্গীতের কথা শুনিয়াই হাস্য করিত। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে ইহাদের ব্রহ্ম মহাশয়ও বড় সৌখিন হ'য়ে পড়েছেন। তাঁহার সপ্তাহে সপ্তাহে নিত্য নূতন গান চাই, সেতার, তানপুরা, মৃদঙ্গ, করতাল, ও হার্ম্মোনিয়ম চাই, তথা সুর-লয়-তান ও রাগ রাগিণীপূর্ণ রং চং দিয়া মজাদার গীত বাদ্য চাই। ব্রাহ্ম মহাশয়ের থাকিবার জন্য সুন্দর, পরিষ্কার ইংরেজী ফ্যাসনের পাকা বাড়ী চাই। বড় বড় পতাকা ও নিশান দণ্ড চাই। ফুলের তোরা, আম্রপল্লবসহ পূর্ণকুম্ভ ও কদলী বৃক্ষও ব্রাহ্ম মহাশয়ের ভাল লাগে। বলুন ত এর নাম কি নির্গুণোপাসনা? ইহাই কি আপনারা বলেন শুদ্ধ ধ্যানাদি দ্বারা সম্পন্ন?

(খ) বস্তুতঃ নির্লেপ, সচ্চিদানন্দ, নিরাকার ও নির্গুণ স্বরূপের ধ্যান হইতে পারে না। কেবল পরমহংস ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগসম্পন্ন পুরুষেরাই সেই চিন্ময়রূপে ডুবিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি আবার বলিব ইঁহারা ব্যতীত অপর কেহই নিরাকারের ধ্যান করিতে পারে না, ইহা অটল সিদ্ধান্ত। তথাপি তর্কের খাতিরে স্বীকারও যদি করা যায় নিরাকারোপাসনা ধ্যানাদি দ্বারা সম্ভব, তাহা হইলেও দেখা যাউক, মূর্ত্তিপূজা উহার সহায়ক কি প্রতিবন্ধক। এজন্য আরসব যুক্তি তর্ক চুলোয় যাক, প্রথমতঃ বড় বড় নিরাকারোপাসকদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন; তাঁহারা সাকারোপাসনা হইতে কোন রূপ সাহায্য গ্রহণ করেন কি না। আমি আজ কালিকার নাবালক ব্রহ্মজ্ঞানীদের উদাহরণ দিতে চাই না, যাহারা ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করাকেই ভববন্ধনচ্ছেদ এবং স্ত্রীলোকের অবরোধভেদকেই মায়াবরণভেদ মনে করে এবং যাহারা সোডাওয়াটার, বিস্কুট ও উইলসেনের হোটেলে পরব্রহ্মের অন্বেষণে ফিরে। আমি অতি প্রাচীন ব্রহ্মবাদী পরম প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যখন

পদার্থকেই সত্য বলিয়া মানিত; আত্মার অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার করিত না। এমন সময়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং এমন বিচিত্রভাবে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিলেন যে, সমস্ত নাস্তিকের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। প্রিয় সভ্যগণ! যাহাদের কোন মত আছে, গ্রন্থ আছে, সম্প্রদায় ও দর্শন আছে, তাহাদের সমালোচনা করিতে যাইয়া অল্প বিস্তর দুই চারি কথা সকলেই বলিতে পারে। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, মত, সম্প্রদায় কিছুই নাই, এমন হাতা-মাথা-হীন, নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব, কুষ্মাণ্ডবৎ ধড়ের সমালোচনায় কেহ কিছু বলিতে চাহিলে কি বলিবে? এজন্য নাস্তিক-দিগের এবং নাস্তিকভাবাপন্ন নগণ্য লোকদের মত খণ্ডন করা অতি কঠিন। কিন্তু, ইহা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যেরই উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছিল যে, তিনি উহা-দের ঠিক বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে তাল ঠুকিয়া তাহাদের সম্মুখে দাড়াইলেন। নাস্তিকদের বুলি ছিল "ব্রহ্ম মিথ্যা, জগৎ সত্য" শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"। নাস্তিকেরা সকলকে জগজ্জালে জড়াইতেছিল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সকলকে ব্রহ্মানন্দে ডুবাইতে আরম্ভ করিলেন এবং স্বীয় বাক্‌চাতুর্য্যে নাস্তিককে আস্তিক বানাইয়া নাস্তিকতার মূলোচ্ছেদ করিলেন।

নাস্তিকদিগকে ভক্তির উপদেশ দেওয়া যায় না, এজন্য প্রথমে তাহা-দিগকে আস্তিক তৈরি করা আবশ্যক। ইহাতেই শঙ্করাচার্য্যের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। পরন্তু এত বড় বৈদান্তিক হইয়াও তিনি নিজে কেমন ভক্ত ছিলেন। যে মোক্ষ পাইবার জন্য ভয়ানক জ্ঞানের শরণ লইতে এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও ঝগড়া বিবাদ করিলেন, স্বয়ং সেই মোক্ষপথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ভিক্ষা করিতে বসিলেন! ইহা তাঁহারই রচিত স্তোত্র "ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা......জননং যাতু মমবৈ ভবানী রুদ্রাণী শিব শিব মৃড়ানীতি জপতঃ" তিনি বলিতেছেন 'আমি মোক্ষাদি কোন সুখই চাই না। যতদিন বাঁচিব, কেবল শিব শিব, ভবানী ভবানী জপিতে থাকিব।' আরও দেখুন, তিনি আপন ষট্‌পদীতে কি বলিতেছেন—"দামো-দর গুণমন্দির সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ। ভবজলধিমথনমন্দর পরম দর-মপনয় ত্বং মে।" অর্থাৎ "হে দামোদর, হে গুণ-মন্দির, হে সুন্দর মুখকমল-যুক্ত, হে গোবিন্দ, হে সংসার-সমুদ্র-মন্থন-দণ্ড-মন্দরাচলসদৃশ, আমার মহা-কাঙ্ক্ষা মিটাও।" দেখুন স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য এতদূর নির্গুণ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং 'নেহ নানাস্তি' বলিতে বলিতে জগৎকে মিথ্যা সাব্যস্ত, ব্রহ্মানন্দের তরঙ্গে

জগৎকে তরঙ্গিত ও প্লাবিত করিলেন, কিন্তু, তাঁহার নিজের স্তবস্তয় এইরূপ ঝকমারিতেও গেলনা। তাই দামোদরের কাছে হাতযোড় করিয়া কান্দিতে হইল এবং বলিতেই হইল, "পরমেশ্বর প্রতিপাল্যো ভবতাভবতাপভীতোঽহম্।" কে বলে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সগুণোপাসক ছিলেন না, পরম ভক্তপুরুষ ছিলেন না, কেবল শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন? তাঁহার সৌন্দর্য্যলহরী, আনন্দমঞ্জরী, ষট্-পদী, চর্পটী আদি গ্রন্থ দেখিলে ভক্তি ও সগুণোপাসনা চক্ষুর নিমেষেই বুঝিতে পারা যায়। আমি এ কথার উপর অধিক জোর দিতে চাই না যে, তিনি গৃহে শালগ্রাম চক্র রাখিতেন, বা নর্ম্মদেশ্বরের পূজা করিতেন কি না। আমার শ্রোতৃগণ স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন। যখন তিনি উপরোক্ত ভাবে সাকার, সগুণ, কালী, কৃষ্ণ, শিবভবানীর সেবক ছিলেন, তখন মূর্ত্তিপূজাকে তাঁহার উপাসনার অনুকূল বুঝিতেন কি প্রতিকূল?

যদি এমন কোন অবিতর্কিতশক্তিসম্পন্ন প্রবল মহাত্মা থাকেন, যাঁহার এমন সামর্থ্য আছে যে, একেবারে ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া নির্ভয় হইতে পারেন ত এমন সৌভাগ্যশালী নন্দদুলালেরাই তাঁহাদের কথা জানেন, আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু চিত্ত স্থির করিয়া পরমাত্মায় লীন হইলে এবং জগতের মায়াজাল বিস্মৃত হইলে তাহাতেই মোক্ষ যখন সিদ্ধান্ত হইতেছে, তখন চিত্তকে স্থির করা, জগৎকে বিস্মৃত হওয়া ও আত্মায় মজিয়া যাওয়া এই তিনটীই হইতেছে কার্য্য ও উদ্দেশ্য। ইহা কেবল মুখে বলিলে চলে না, কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। জন্মজন্মান্তর হইতে যে বিষয়কূপে ডুবিয়া রহিয়াছি, নিগুণী লোকেরা বলিলেই কি চক্ষের নিমেষে তাহা ভুলিতে পারা যায়? এখানে একটী কথা আপনারা অনুগ্রহ করিয়া একবার মনে মনে কল্পনা করুন। একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তাহার চারি দিকে বাঁধা ঘাট, উহার ঠিক মধ্যস্থলে এক বটবৃক্ষ। বটের পল্লবিত ঘন শাখা চারি দিকে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে, চারি পার্শ্বের সীড়িতে কুঞ্জ বনের ন্যায় শোভা হইয়াছে— মিনিট মাত্র সময়ে ইহাকে একবার মনে মনে ভাবিয়া লউন। (হাঁ হাঁ, হই-য়াছে) আচ্ছা, এখন আমার সানুনয় নিবেদন এই ছবিটী একেবারে ভুলিয়া যাউন ত! (করতালি) ইহা অবশ্যই মিথ্যা, আপনারাই মানিয়া লইয়াছেন মাত্র। ভুলে যান, কেন মহাশয় 'জগৎ মিথ্যা' ইহা অভ্যাস করিয়া যদি জগৎকে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে এ বট মিথ্যা, পুষ্করিণী মিথ্যা, বার বার অভ্যাস করিয়া ইহাকেও ভুলিয়া যান। ভাল, কিছুদিন ছুটী লইয়া রোজ ২।১ ঘণ্টা

মনে মনে উলট্ পালট্ করিতে থাকুন, যে দিন ভুলিতে পারিবেন, আমাকে আসিয়া জানাইবেন। (অধিক জয়ধ্বনি) সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে জগন্মিথ্যা স্বীকার করিলেও অধ্যাস জ্ঞান সহজে বিদূরিত হইবার নহে।

কভু কভু মানুষের দিগ্ভ্রম হইয়া যায়। তখন তাহার বোধ হয়, দক্ষিণ দিকে সূর্য্যোদয় হইতেছে। এক একবার তাহার খট্কা লাগে, এ কেমন হইল! আমি যাহাকে দক্ষিণ বলি, সে দিকে সূর্য্য ও চন্দ্র আসিল কোথা থেকে? আবার ভাবিয়া লয়, না, এ কখনই হইতে পারে না, সূর্য্য কি কখনও পূর্ব্ব ছেড়ে দক্ষিণে যাইতে পারে? এ আমার নয়নেরই মহিমা যে পূর্ব্বকে দক্ষিণ বুঝিতেছি। ইহা আমারই সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইহা নিশ্চয় হইবার পরেও লোকে উপরে উপরে বুঝিয়া লয় বটে, কিন্তু ভিতরের খট্কা কিছুতেই যায় না।

বলিতে পারেন, ইহার কারণ কি? বেশী দিন যাবৎ দিগ্ভ্রম হয় নাই। এরূপ ভ্রম অটল রহিবার সামগ্রীও নহে। ইহাকে দূর করিবার পক্ষে দিবাকর তেজঃপুঞ্জ নারায়ণের ন্যায় উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় অন্ধকার বিনাশ করিতে সম্মুখে বিদ্যমান। শত শত বন্ধুবান্ধবেরা চারিদিকে হাতে তালি দিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে ও বলিতেছে "হো, হো, হো, পূবকে বলে দক্ষিণ!" নিজেও জানি "যস্যামুদেতি সবিতা কিল সৈব পূর্ব্বা।" ইহাও ঠিক বুঝিতেছি নিঃসন্দেহ আমারি ভুল, তবুও মন হইতে খট্কাটা যাই-তেছে না। এইরূপ ক্ষণমাত্রের ভ্রান্তি ভূতেরন্যায় ঘাড়ে চাপিলে কত তন্ত্রমন্ত্র খাটাও কিছুতেও ছাড়িবে না। সন্ধ্যাপূজার সময় খুব বিচার করিয়া পূর্ব্বমুখে বসিয়া আহ্নিক করিতে থাক, কিন্তু কিজানি কেন কাণের ভিতর শোঁ শোঁ করিয়া বাজিবে 'এদিকে সূর্য্য দেখে পূব বল্চি বটে, কিন্তু এটা পূবের মতন লাগ্চে না'। বলুন ত, এ ভ্রমবাসনা মন হইতে দূর হয় না কেন? বুঝিতেও পারা যায় না, এমন ভ্রম কোথা থেকে এসে জুটিল এবং কেমন করিয়াই বা মাথায় ঢুকিল। আমরা দেখিতে পাই, এই রকম একটা সামান্য ভ্রমও কত ফিকির করিলেও সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া থাকে। তখন ভাবুন দেখি, যাহা অনাদি বাসনায় লিপ্ত রহিয়াছে, যাহার আরম্ভ সময় জ্ঞানাতীত, যে ভ্রমকে বহাল রাখিতে কোটি কোটি দুর্ব্বাসনা নিয়ত প্রত্যক্ষে চেষ্টা করিতেছে এবং জন্ম জন্মান্তর হইতে যাহার অভ্যাস চলিয়া আসিতেছে, চট্ করিয়া তিন তুরীতে তাহার মূলোৎ-

পাটন কিরূপে হইবে? অতএব যাঁহারা 'ভ্রান্তিদূর হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে ও মোক্ষ পদ লাভ হইবে,' ইহা মনে একবার ছুঁয়াইয়াই সগুণোপাসনা ছে'ড়ে ছু'ড়ে দিয়ে বাপে খেদান মায়ে তাড়ান' (ঘরকে ন ঘাটকে) হইতেছেন, তাঁহারা কি বুদ্ধিমানের কাজ করিতেছেন?

দেখুন, সেই বৈদান্তিকদিগেরই সিদ্ধান্ত মূর্ত্তিপূজা দ্বারা কেমন সুন্দররূপে প্রমাণিত হয়। জগতের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যাওয়া কথাত এই। ইহাই সাধন করিতে অহন্তা-মমতাদির ত্যাগ আবশ্যক এবং ইহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'জগন্মিথ্যা, জগন্মিথ্যা,'। কিন্তু, "পাদাঙ্গুষ্ঠশিরীষাগ্রিঃ কদা মৌলিমবাপস্যতি" কত দিনে জগতের বিস্মরণ ও ব্রহ্মপদলাভ হইবে? বেশ বাপু, কোন অধিকারী যদি ঐরূপ সাধনে জগতের মায়া ও সম্বন্ধ পাশ কাটাইতে পারেন এবং আত্মানুভবলাভ করিতে পারেন, আমি তাঁহাকে কিছুতেই মানা করি না, তিনি ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকুন। কিন্তু একবার দেখুন ত ভক্তদিগের জন্য কি অপূর্ব্ব সোপান রহিয়াছে! যেমন কোন রোগী ঔষধ খাইতে না চাহিলে এবং কুপথ্য ঘৃত ভোজন বিনা না থাকিতে পারিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা সেই ঘৃতকেই এক স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঔষধ মিলাইয়া রোগীকে খাইতে দেন, তেমনি জন্মজন্মান্তরের বিষয়াসক্ত জীব মহৌষধি স্বরূপ পরমাত্মায় ডুবিতেছেন না এবং পরম কুপথ্য বিষয়কে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। সুতরাং কি অপূর্ব্ব যুক্তি করা হইয়াছে যে, কুপথ্যেই ঔষধ মিলাইয়া দেও। বহু জন্ম হইতে যে জগজ্জালে আবদ্ধ হইয়া জীব দুঃখসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে ও নানা কষ্টভোগ করিতেছে, সেই জগৎই অমৃতময় হইয়া গিয়াছে। আপনি গানে যদি এতদূর মজিয়া থাকেন যে, ঘুমের ঘোরেও কাণে মৃদঙ্গের বোল লাগিয়া থাকে, তবে আমি আপনাকে সঙ্গীতের আসক্তি ছাড়িতে বলি না, ভগবৎ-মন্দিরে বসিয়া ভগবৎ সম্বন্ধীয় ভজন সঙ্গীতের আলোচনা করুন। নিজেই দেখিবেন, আপনার চিত্ত কেমন একাগ্র হইয়া ভগবৎ বিষয়ে নিমগ্ন হইবে। ইহা সঙ্গীতেরই মাহাত্ম্য। যে মনকে যোগিগণ নিরত কঠিন তপশ্চারণ ও কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারাও সংযত ও বশীভূত করিতে পারে না, সেই চঞ্চল মনকে সঙ্গীত ক্ষণমাত্রেই বশীভূত করিয়া ফেলে। ইহা সঙ্গীতেরই মহিমা যে কোথায়ও যদি কেহ সুরতালান্বিত, অর্থসঙ্গতিহীন তানা না না না আরম্ভ করিল, অমনি শ্রোতৃবৃন্দ বাহজ্ঞানশূন্য কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ

সঙ্গীতের তালে তালে হৃদয়-মন-প্রাণ দোলাইতে আরম্ভ করিল। আর ভাবিবার অবসর থাকিবে না, কি করিতেছে, কি দেখিতেছে, কত বেলাই বা হইল! সেই তাল মান লয় মধুর চিত্তবিমোহন সঙ্গীত নিস্বনে যদি অর্থসঙ্গতি থাকে, তবে তাহাতেই মন গলিয়া যাইবে, এবিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি সঙ্গীত খারাপ অর্থে রচনা করিলেন ত তাহা নরকে যাইবার অদ্বিতীয় সোপান হইল (যেমন প্রচলিত খেম্‌টা, টপ্পা প্রভৃতি)। পরন্তু, যদি ঐ অর্থজ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের উদ্দীপক হয়, তাহা হইলে বলিতে কি তৎক্ষণাৎ জগৎ বিস্মৃত হইয়া চিদানন্দের আনন্দ রসে ডুবিয়া থাকুন। মতিচ্ছন্ন, শুষ্কহৃদয় দুর্ম্মতি নাস্তিকাধমেরা ইহার ভাবগ্রহ কথনই করিতে পারিবে না। কিন্তু, যে একবার মহাত্মাদের সঙ্গ পাইয়াছে এবং ভজনানন্দে ডুবিয়াছে, সেই জানে সমাধির কি অদ্ভুত আনন্দ! তাহাতে সাধক "হে পতিতপাবন অধমতারণ তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে" (ম্যায় প্রভু পতিতপাবন সুনেঁ। ম্যায় পতিত তুম পতিতপাবন দোউ বানক বনে।) (জাঁউ কহাঁ ত্যজি চরনতিহারে) "কোথা যাই ত্যজিয়া চরণ তোমার (জাকে প্রিয়ন রাম বৈদেহী) ইত্যাদি ভজন মুক্তকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চিত্ত একেবারে অভিমান ও অহংজ্ঞান শূন্য হইয়া ভগবচ্চরণে বিলাইয়া যায়। এবং আপনার দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া পড়ে। স্বর কলাপে ডুবিয়া সংগীত নাদে হেলিতে দুলিতে চিত্ত সংসারকে ভুলিয়া যায় এবং তাহারই অর্থে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় ও তাহাতেই মোহিত হইয়া আনন্দ পীযূষ পান করিতে থাকে। আরাধনা করিতে করিতে যে ভক্তজনমনোমোহন সগুণ মূর্ত্তি সাধকের হৃদ্‌পটে আবির্ভূত হয়, চক্ষু খুলিয়াও বিগ্রহরূপে তাঁহাকেই সম্মুখে বিরাজমান পাওয়া যায়। ভজনে তিনি, হৃদয়ে তিনি, নয়নে তিনি কথাতেও তিনি। তাঁহার নাম করিতে করিতে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে ভক্ত দেখিতে পান, তাঁহারই নাম রামনামের ছাপে, তাঁহারই নাম ললাটে তিলকে; লম্বমান পট তাঁহারই প্রতি অঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই নাম স্মরণ করাইতেছে, তাঁহারই রূপ বর্ণনার স্তোত্র পাঠ হইতেছে, তাঁহাতেই মজাইতে তদ্বিষয়ক পৌরাণিক কাব্য পাঠ হইতেছে। তিনি যে দীনবন্ধু, তিনি যে ভক্তবৎসল, তিনি যে পতিতপাবন, তাহা অণু অণু করিয়া প্রতি লোমকূপে বিন্ধিতেছে! এইরূপ সময়েই এইরূপ অবস্থায় চিত্ত একেবারে জগৎ হইতে অনাসক্ত ও পৃথক হইয়া তাঁহারই প্রেম সাগরে ডুবিয়া যায়। শ্রাবণে তাঁহারই উৎসব, ভাদ্রে তাঁহারই উৎসব। গ্রীষ্মে তাঁহারই

মন্দিরে ফুলের বাহার, দোল যাত্রায় তাঁহারই আমোদে আবিরের হোলীখেলা! আশ্বিনে মাতৃরূপে তাঁহারই আবাহন, কার্ত্তিকে তাঁহারই উৎসবের দীপ-মালা ও অন্নকুট। মাঘে শ্রীপঞ্চমী ও বসন্তোৎসবে তাঁহারই জয় কীর্ত্তন। মূর্ত্তিপূজায় সাধু লোকদিগের সমস্ত বৎসর পরমাত্মার স্মরণে ও আনন্দে ডুবিয়া অতিবাহিত হয়; প্রতিদিবসও সেইরূপ আনন্দেই যাপন করা হয়। যেহেতু প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই "প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথমুখারবিন্দম্" বলিতে বলিতে মঙ্গল আরতি দর্শন হইল। আহা, ইহার আনন্দ তিনিই অনুভব করিতে পারেন, যিনি একবার মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়াছেন। সে সময়ের কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, যেন রজনীর গাঢ় অন্ধকার ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ সরিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বদিক একটু একটু পরিষ্কার হইতেছে, পাখীরা মৃদু মধুর স্বরে কূজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুশীতল প্রভাত-হিল্লোল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে—এমন সময়ে নারায়ণের নাম লইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যসমাধা করিয়া জয় জয় করিতে করিতে মন্দিরের দিকে দৌড়িতেছে, আর তথায় দলে দলে জয়ধ্বনি করিতেছে এবং সুশোভিত ও সুসজ্জিত দেবমূর্ত্তির দর্শন হইতেছে। দর্শনত করি বিতস্তি প্রমাণ প্রতিমার, কিন্তু না জানি কেমন করিয়া তখন সেই সর্ব্বব্যাপকের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আমরা সাধারণ বৈভবে ইঁহাকে সাজাই; কিন্তু জানি না, কেন চক্ষুর নিকট সেই বৈভব উদ্ভাসিত হয়, যাহাতে মনে হয়, যেন আমি সেই পুরুষোত্তমে ডুবিয়া রহিয়াছি, যাঁহার প্রতি লোমকূপে কোটি ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা শত শত খেলানা পুতুল দেখিয়া থাকি এবং বলিতে গেলে সেই রূপ একমূর্ত্তিই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু এ মূর্ত্তি জানি না, কেমন অদ্ভুত যাদু ও ভেল্কী করিতে জানে। যে দর্শন করিতেছে, তাহারই হৃদয় গলিয়া যাইতেছে এবং ভগবদ্ ভক্তির ও পরমাত্মার আনন্দ-অশ্রু তাহার নয়নে বহিতেছে। (জয় ধ্বনি) প্রিয় সভ্যগণ, এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে সজ্জা, ভোগ, সন্ধ্যা আরতি, শয়নআরতি প্রভৃতি একটী না একটী আমোদ লাগিয়াই রহিয়াছে। এবং প্রতি দিন তাহাতেই অতিবাহিত হইতেছে। দিন সমষ্টি গঠিত সম্পূর্ণ জীবনও এই ভাবেই কাটিতেছে।

যদি "ব্রহ্ম ব্রহ্ম, জগন্মিথ্যা" বলিয়া বেড়াইলেই জগৎ হইতে মুক্ত হওয়া যাইত এবং শরীরকে ক্লেশ দিয়া নাক টিপিলেই যদি আনন্দময় সমাধি হইয়া

যাইত ও সগুণোপাসনা ভক্তিমার্গ ও ভজন ভাবকে জগন্মাতার বিরুদ্ধ বুঝা যাইত, তাহা হইলে ভগবদ্বিষয়ে বেদের লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করিবার আবশ্যক কি ছিল? জগতের সম্বন্ধছিন্ন করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইবার উপদেশ ত অল্পেই হইয়া যাইত। বিস্তৃত হইয়াছে কেবল ভক্তিমার্গ ও সগুণোপাসনা প্রসঙ্গে—যাহাতে এক নাম লক্ষ বার উচ্চারণ করিলেও পুণ্য বলিয়া গণ্য হয়। ভাল বলুন ত এ সকল ক্রিয়া-কাণ্ড কি জন্য? পূজা অর্চ্চনা কিসের তরে? আর স্তবই বা কাহার! যজ্ঞ কুণ্ডের ধারে বসিয়া হোতাই বা ঝুকিয়া রহিয়াছেন কেন, আহুতিই বা ঢালা হইতেছে কেন? কাহার বর্ণনার জন্য বড় বড় মন্ত্রের গাথা গীত হইতেছে? বেদেরই বা কি দায় পড়িয়াছে যে "নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্কারায় চ, নমো হিরণ্যবাহবে, বাহুভ্যামুত তে নমঃ" ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করা হইয়াছে।

হাঁ, হয়ত আমাদের কোন নব্য সাম্প্রদায়িক মহাশয় মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া আমাদের উপর কটাক্ষ করিতে করিতে স্বগত উক্তি করিবেন যে, যজ্ঞ কার্য্যতঃ এইজন্য যে ঘৃত ও দুগ্ধ জ্বলিয়া ধোঁয়া হইবে, তাহাতে মেঘ-সৃষ্টি হইয়া জগতের উপকার করিবে। পরন্তু ঈশ্বর করুন, তাঁহাদের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তাঁহাদের কাছেই থাকে; কোন বালকের কোমল-হৃদয় কলুষিত ও দুর্গন্ধিত না করে। ইঁহারা আমাদিগের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলেন, "বাবা বাক্যং প্রমাণম্"। কিন্তু ভাই সকল, আমাদেরওত "মুনিবাক্যং প্রমাণম্, বেদবাক্যং প্রমাণম্, ব্যাসবাক্যং প্রমাণম্, পণ্ডিতবাক্যং প্রমাণম্"। তাঁহাদের বাবা দয়ানন্দজীর লেখা ও উক্তি তাঁহাদের প্রমাণ। উহা কেবল তাঁহাদেরই 'বাবা বাক্যং প্রমাণম্' অপরের নহে।

একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও একথা বুঝিতে পারে যে, কোন রূপে ঘি, চিনি, মেওয়া, মিশ্রী, মোহনভোগ ও ক্ষীর আগুণে জ্বালানই বেদের মর্ম্ম কি না, যাহাতে খুব আঁধারে ধোঁয়া হইবে। বেশ, বেদ যদি কেবল এইটুকু বলেন, তবে উহাতে একথার কি প্রয়োজন ছিল যে, বেদী এত আঙ্গুল লম্বাচৌড়া হইবে, বেদীর আকার এইরূপ হইবে; এই মন্ত্রে আহুতি দিতে হইবে, প্রোক্ষণী প্রণীতা প্রভৃতির এইরূপ আকার হইবে? যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি করা ও ব্যাধি হাওয়া দূর করাই তাহার একমাত্র ফল হইত, তাহা হইলে অল্প অল্প গন্ধক ছড়াইতেও বেদে উপদেশ থাকিত। কিন্তু, এই সকল বিশাল বুদ্ধি মহাত্মাদের এইরূপ যুক্তিই "বাবাবাক্যং প্রমাণম্"। মাথা

মুণ্ডু যাহাই হউক না কেন, বাবাজী সরস্বতীজী যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহাদের মিষ্ট লাগিবে। কোন কোন নব্য শিক্ষিত বাবু বলিয়া থাকেন 'না মহাশয়, প্রকৃতি বিদ্যা অনুসারে ( Physics ) একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভাল ধূম হইতে ভাল মেঘের উৎপত্তি হয়।' সাবাস, সাবাস কি বিদ্যার দৌড়! ইহা কোন্ পুস্তকে লেখা আছে! কখনও কি প্রকৃতি-বিদ্যার মুখ দেখিয়াছ? এ ধোঁয়া যে মেঘ পর্য্যন্ত পৌঁছে একথাও তোমার প্রকৃতি বিদ্যা বলিবে না। বিজ্ঞান বলেন, মেঘ কেবল জলীয় বাষ্প হইতে উদ্ভূত হয়। যদি ধূমকেই বাষ্প বলিতে চাও, তাহা হইলে জগৎ প্রসিদ্ধ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এ অনুমানত বেশ ঠিকই করা হইয়াছে!! এবং "ধূমাভাব-বান্হ্রদঃ" এ সিদ্ধান্তেও জলাঞ্জলি দিতে হইল।

বস্তুতঃ বাষ্পও ধোঁয়া নহে এবং চিনি ও ঘৃত দুগ্ধের ধূম হইতেও মেঘ জন্মে না। মেঘ যদি ঘৃতজাত ধূম হইতে উৎপন্ন ওপরিপুষ্ট হইত, তবে আমরা ঘৃত বৃষ্টিই দেখিতে পাইতাম! ঘৃত ও চিনির গুরুধূম নীচেই রহিয়া যায়, অত উর্দ্ধে মেঘ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে না।

ইহা মনে করিবেন না যে, ইংরাজী বিদ্যা আসিয়াই আমাদের এসব বিষয়ে অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছে এবং ভারতে আর্য্য-ঋষিদের কেহই জানিতেন না যে, মেঘ কিরূপে জন্মে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এসম্বন্ধে শ্লোক শুনুন "ধূমভূতাস্ততাস্বাপো নিষ্ক্রামন্তীহ সর্ব্বতঃ। ততো মেঘাঃ প্রজায়ন্তে স্থানেমভ্রমপাং স্মৃতম্।"

আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যাক্, আপনারা আবার সেই কথায় চলুন। বেদ যে নমঃ নমঃ করিয়া এত লম্বা চৌড়া স্তোত্র রচনা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কেবল ভক্তির উদ্রেক করিতে।

পাতঞ্জলযোগের উপদেশে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" (যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ), "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' ইত্যাদি। মুনি ঋষিদের ছোট ২ ঈশারায় অনেক বড় ২ কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল ইঙ্গিত হইতে যাহার যেমন অভিরুচি কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি সগুণমূর্ত্তি ধ্যান করিবার অর্থ সূচিত হয়। ইহা হইতে যদি কেহ ছড়ি, ছাতা, জুতা ধ্যান করিবার অর্থ বাহির করিতে চান ত করিবেন, তাঁহাকে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

দেখুন, কেমন সরল সহজ মার্গ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সকল পদার্থেই

'আমার, আমার, আমার,' যে দৃঢ় দুর্ব্বাসনা বজ্রলেপ সদৃশ বদ্ধ রহিয়াছে, তাহা অতি সহজেই তিরোহিত হইয়া যায়। এই আসক্তি ও বিষয়ে মমতা সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক বলিতেছে "অশনং মে বসনং মে জায়া মে বন্ধুবর্গো মে। ইতি মে মে নিগদণ্ডং কালবৃকো ইতি পুরুষাজম্।" হিন্দী ভাষা বলিতেছে, "মেরী মেরী করত মিলেগো অন্ত মাটীমে।" আমার আমার বলিতে বলিতে অন্তে মাটীতে মিলিবে। দেখুন সেই, মমতা (আসক্তি) ধীরে ধীরে কেমন সুন্দর ভাবে অপসৃত হইতেছে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ইহা কি আপনার? উত্তর হইবে, আমার আবার কি? সবই ঠাকুরের। ঘরও ঠাকুরের; ধনও ঠাকুরের। এমন কি, ছেলে পিলেদেরও রামদাস, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুচরণ, হরিচরণ প্রভৃতি নাম রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার উপর এমনি অনন্য চিন্তা জন্মিয়াছে যে, বলা হয়, ইহারা আমার কে, নারায়ণের দাস, তাঁহারই সব। কেহ, কোন কার্য্যোপলক্ষে যাইতে হইলে প্রথমে মন্দির দর্শন ও দেবতাকে প্রণাম করিবে, পরে তাঁহারই নাম করিতে করিতে যাত্রা করিবে। যত বড় দুরূহ কার্য্যই হউক না, বল ও ভরসা ভগবানের। কৃতকার্য্য হইলে হৃদয়ে অভিমান আসিতে পারে না, মনে হয় প্রভুর ইচ্ছারই জয়। যেরূপ আকৃতির ও সাজসজ্জায় দেব মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিবার শক্তি আছে, চক্ষু খুলিলেও তাঁহার দর্শন এবং চক্ষু মুদিয়াও তাঁহারই ধ্যান হয়। তাঁহাকেই ভগবদবতার স্বরূপ এবং ভগবদবতারকে সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ মনে করিয়া পরম্পরা ক্রমে সেই জগদীশ্বরেই চিত্ত নিমগ্ন হইয়া যায়। বলুন ত বন্ধুগণ এরূপ মূর্ত্তিপূজা কি যোগ ও বেদান্ত বিরুদ্ধ? এই রূপ ভক্তিভাবে কি সমাধির কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে? কখনই নহে। করিলে বরং সাহায্যই করে, বিরোধ নহে।

(গ) তৃতীয় বিচার্য্য বিষয় হইতেছে—"যিনি ভগবদ্ধ্যানে ডুবিয়া সমাধি মস্ত হইয়াছেন এবং তন্ময় তদ্গত হইয়া গিয়াছেন তাহাকেও কি আমরা সমাধি ভঙ্গ করিয়া মূর্ত্তিপূজা করিতে বলি?" এ বিষয়ে আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনি পরমহংস হইয়া গিয়াছেন, যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দে ডুবিয়াছেন, যিনি আত্মহারা হইয়া আপনাকে ভুলিয়াছেন, যিনি উন্মত্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য শ্রুতিবাক্‌শক্তিহীন, যাঁহার নিকট কাঁচ কাঞ্চন উভয়ই

তুল্য, যিনি দিগম্বর, লজ্জাহীন, তাঁহাকে আমরাও মূর্ত্তি পূজার উপদেশ দেই না, তিনিও আমাদের কথা শুনিতে পান না।

বর্ত্তমান প্রশ্নের পূর্ণ সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার এই বুঝিতে হইবে— প্রশ্ন ছিল "নিরাকারের উপাসনা ধ্যানাদিদ্বারা সম্ভব হইলে মূর্ত্তিপূজা কেন"। উত্তরের সারাংশ হইল "(ক) কেবল ধ্যানাদিদ্বারা নির্লেপ নির্গুণ ও নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না। (খ) সম্ভব হইলেও মূর্ত্তিপূজা তাহার অনুকূল, প্রতিকূল নহে। (গ) যদি কেহ সাধনা বলে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা বহির্বৃত্তি সম্পন্ন হইয়া মূর্ত্তি-পূজার উপদেশ শুনিতে বলি না।"

অতঃপর পঞ্চম প্রশ্ন।—

(৫) "মূর্ত্তিপূজা দ্বারা ভারতবর্ষের এতদূর অধোগতি হইয়াছে, কোনও উপকার হয় নাই, সুতরাং তাহা আবার কেন?"

এ প্রশ্ন সম্বন্ধে দুইটী বিষয় বিবেচ্য আছে, ১মতঃ (ক) মূর্ত্তিপূজা দ্বারা ভারতবর্ষের কোনও অপকার হইয়াছে কি না (খ) দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কোনও লাভ আছে কি না। যদি প্রমাণ করিতে পারা যায়, মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ভারতহর্ষের কোনই ক্ষতি হয় নাই, পরন্তু লাভের সম্ভব আছে, তাহা হইলে এ আপত্তি ভূয়ো হইয়া যাইবে।

(ক) আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ভারতের কি ক্ষতি হইয়াছে! আপনারা কি কোনও ইতিহাসে পড়িয়াছেন যে, কোনও সময় কোন মন্দির হইতে বিকটাকার ঘোর দংষ্ট্রা কালী দন্ত কট মট করিতে করিতে বাহির হইয়া লোকের তুণ্ড চিবিয়া খাইয়াছেন? বীর হনুমান কি কখনও গাছ পাথর ফেলিয়া ঘর বাড়ী গ্রাম নগর চুরমার করিয়াছেন? নৃসিংহ প্রভু কি কখনও কোন পাড়াগায়ে বলদ পঞ্চাননের পেট চিড়িয়া ছিলেন! সত্যনারায়ণদেব কি কখনও কাহারও স্বাধীনতা ধ্বংশ করিয়াছেন? সরস্বতী মাতা কি কাহারও সংস্কৃত বিদ্যায় বাদ সাধিয়াছেন? শ্রীরামচন্দ্র কি আপনাদের কামনা বাসনা বাড়াইয়া দিয়াছেন? শ্রীরঙ্গ প্রভু কি কোন কুঢঙ্গ শিখাইয়াছেন? বিশ্বনাথ কি কাহারও সর্ব্বনাশ করিয়াছেন? রাধা কি কোন বাধা উৎপাদন করিয়াছেন? গঙ্গা আপনাদের কি শঙ্কা বাড়াইয়াছেন? ঠিক্ ঠিক্ বলুন, মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ভারতের কি ক্ষতি হইয়াছে?

মূর্ত্তিপূজা বলিতে এই বুঝায় যে, জগদীশ্বরের কোন প্রতিনিধি মানিয়া তদ্বারা চিত্তসংযম পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করা এবং তদ্গত তন্ময় হইয়া যাওয়া। ভাল, এখন আপনারা স্বয়ং বিচার করিতে পারেন যে ইহাদ্বারা দেশের কোন হানি হইতে পারে কি না। কেহ হয়ত বলিবেন, কেন হানি হইবে না, দেখুন না আমরা সকালে ৯টা পর্য্যন্ত বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে পটু আর্য্য সমাজের লোক। ধারে পাশে কোথায় ও মন্দির হইলে প্রত্যুষেই শঙ্খ ঘণ্টার তুমুল ধ্বনিতে আমাদের কর্ণ বিদীর্ণ করিতে থাকে। ইহা কি কম ক্ষতির কথা!' এরূপ ছেলেমী বিতণ্ডার জল্পনা ও কল্পনায় উত্তর দিতে আমি নারাজ।

(খ) এখন অপরাংশের বিচার করা যাউক, "কোনও লাভ আছে কি না"। গম্ভীর ভাবে নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন, যে খানে মহাত্মাদের আশ্রয় অথবা যে খানে ভগবন্মন্দির রহিয়াছে, সেখানে চিত্তে কেমন প্রসন্ন ও শান্তভাব উপস্থিত হয়। সেখানে অবশ্যই ভগবৎ বিষয়েরই আলোচনা হয় এবং পাপ চিন্তা অন্তরে উদয় হইবার অবসর আসিলেও মনে আঘাত লাগে "আহা"! এমন স্থানও কুকার্য্য করিতেছে, কুচিন্তা মনে আসিল!" ভাল যে খানে হৃদয়ে সদ্বৃত্তির উদ্রেক হয় এবং দুষ্প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়, এরূপ স্থানের আধিক্য হইলে কি লাভের কথা না লোকসানের কথা! ইহা মূর্ত্তিপূজারই প্রভাব বশতঃ যে কত নগরকে, নগর, কত গ্রামকে গ্রাম, এই রূপ ধর্ম্মস্থানে পরিপূর্ণ। মূর্ত্তিপূজকেরা গঙ্গাদি নদী গোবর্দ্ধনাদি গিরি, মথুরাদি নগরী ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষকেও আপনাদের উপাস্য ও পূজ্য বলিয়াছেন। সুতরাং ইঁহারা সহস্র সহস্র যোজন পরিমিত ভূমি সাধু কার্য্য নিয়োজিত রাখিয়াছেন, ইহা কি কম লাভের বিষয়? আমি বোধ করি, মন্দিরে তাস পাশা, জুয়াখেলা, মদ্যপান, বেশ্যাগমন কেহ কখনও দেখেও নাই, শুনেও নাই। পরন্তু মন্দিরে ভগবদ্ভজন, স্মৃতিপুরাণের কথা, বেদ-পাঠ, তপজপ মন্ত্র, ধ্যান অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকলেই দেখিয়াছেন। যে মূর্ত্তি-পূজক সম্প্রদায়ের এইরূপ মহিমা, তাহা কি কোন লাভেরই নয়? যেখানে যেখানে ঠাকুরবাড়ী ও দেবালয় আছে, সেখানেই অধ্যক্ষেরা এ বন্দোবস্ত রাখিয়াছেন, যে কোন বিদেশী যাত্রী অতিথি আসিলে ২।৩ দিন আহারের ও অবস্থানের স্থান মিলিবে। ইত্যাদি উত্তম উত্তম রীতি পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে ও এখনও চলিতেছে, ইহা কি লাভের নহে? নব্য যুবকদের

হৃদয়ঙ্গম যোগ্য সামান্য সামান্য দুই চারিটী লাভের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু, আমাদের শ্রেষ্ঠ এবং প্রধানতম লাভ তাহাই, যাহার জন্য মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহাতে মনুষ্যজীবন সফল করে, যে লাভের নিকট অন্য লাভ দাঁড়াইতে পারে না, নিতান্ত অসার ও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। মূর্ত্তিপূজার এতদূর লাভ যে, লোকে আপনা ভুলিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে থাকে এবং পুলকিততনু হইয়া প্রেমাশ্রু ধারায় জন্ম জন্মান্তরের কলুষরাশি বিধৌত করিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ কি হইতে পারে? আমি বিবেচনা করি, আমার শ্রোতৃমণ্ডলীর এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই, যাহা অপনোদন করিতে এর চেয়েও অধিক যুক্তিতর্ক, সিদ্ধান্ত ও বিচার করিবার প্রয়োজন হইবে। হাঁ কোন কোন মেস্তর মহাশয় (Mr.) এক কোণে বসিয়া হয়ত মনে মনে বলিতেছেন যে ইউরোপেত মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত নাই, সে দেশের এত উন্নতি কিরূপে হইল! কিন্তু ইহা 'কিং কেন লগ্নম্' (কি বলিতে কি)। মূর্ত্তিপূজা দ্বারা ভারতের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং লাভ হইয়াছে, ইহার সহিত ইউরোপের উদাহরণের কি সম্বন্ধ! হইলেও আপনারা দেখিতে পারেন, সে এক কেমন দেশ। সে দেশে নিকটে নিকটেই মৃতদেহ পুতিবার কবর খানা ঘিরিয়া রাখে। সেখানে কোন ভদ্রলোক বেড়াইতে যান না এবং হাজার হাজার বিঘা জমি পচা মাংসের ক্ষারে নষ্ট হইয়া যায় এবং মৃত্তিকার সূক্ষ্মরন্ধ্র দ্বারা দুর্গন্ধিত দূষিত বায়ু উপরে উঠিয়া নানা রোগের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে আমাদের এ এক কেমন দেশ, যেথানে হাজার হাজার বিঘা জমি মন্দিরের আঙ্গিনায় পড়িয়া আছে, যেথানে রোগ-শোক-তাপ-ক্লিষ্ট ও ম্রিয়মাণ কেহ গেলেও তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে, যেথানে মধুর সঙ্গীত সুধা পান করিয়া তোতা, ময়না, কোকিলও আপনাপন কণ্ঠ স্বর-তাল-লয়-সঙ্গিত করিতে থাকে, যেথানে পুষ্পবাটিকার প্রফুল্ল কুসুমে অবিরত ভ্রমর-ঝঙ্কার হইতেছে, কোথায়ও বা ধূপ ধূনার সুগন্ধি ধূম্র গাঢ় মেঘবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, কোথায়ওবা কর্পূর-কেশর চন্দনকস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধে নাসিকা তৃপ্ত করিতেছে, কোথায়ও বা দিগন্ত পূরিত জয় জয় ধ্বনিতে রোমহর্ষ উৎপাদন করিতেছে। এই উভয় দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি ও পার্থক্য আপনারাই তুলনায় বিচার করুন। আমি এ তুচ্ছ বিষয়ে সময় ক্ষেপণ করিতে ইচ্ছা করি না।

(জয় জয় ধ্বনি)

এখন ষষ্ঠ প্রশ্ন হইতেছে,—

"সম্প্রদায় ভেদ কেন?" যিনি প্রশ্ন করিতেছেন, বোধ হয়, তাঁহার মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি নাই, কেবল এই টুকুই জিজ্ঞাস্য যে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী কেন! প্রশ্নকর্ত্তার মনে এ কথাও জাগরূক রহিয়াছে যে, (ক) "ভগবদ্ প্রাপ্তির একই প্রকার পন্থা সকলের জন্য হওয়া উচিত। অথবা তিনি হয়ত বুঝিয়াছেন (খ) সম্প্রদায় ভেদ ক্ষতিকারক।"

(ক) মূলার্থ প্রতিফলিত হইতেছে "সকলের জন্যই এক ধর্ম্ম ও এক উপায় হওয়া উচিত; ভিন্ন ভিন্ন কেন?" এ বিষয়ে একটু ভাল রূপ আলোচনা প্রয়োজন, যে হেতু, আজকাল মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, ও দায়ানন্দী সম্প্রদায় সকলেই এই কথার ধ্বজা উড়াইতেছে—'সকলের' জন্যই এক ধর্ম্ম ও এক অনুষ্ঠান হউক। যখন সকলেরই ভগবদ্ প্রাপ্তি রূপ এ কই উদ্দেশ্য, তখন এক পন্থা ও এক পদ্ধতি কেন হইবে না? এ কথার সমালোচনায় প্রথমে দ্রষ্টব্য (১) এক উদ্দেশ্য হইলেও সকলেরই এক প্রণালী ও অনুষ্ঠান হওয়া অত্যাবশ্যক কি না। (২) দ্বিতীয়তঃ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেরই এক উদ্দেশ্য কি না। (৩) পরিশেষে ইহাও বিচার্য্য যে, সকলেরই এক পথে চলিবার এবং এক সাধারণ প্রণালীতে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা আছে কি না।

(১) ইহা নিতান্ত বালকের কথা যে, এক উদ্দেশ্য হইলেই এক উপায় হইতে হইবে। এ কথার না আছে দৃঢ় যুক্তির ভিত্তি, না আছে ব্যবহারের বন্ধন। বস্তুতঃ সংসারের প্রকৃতি ইহার বিরুদ্ধে দেখিতে পাই। দেখুন ক্ষুধা হইলে জঠরানল শান্ত করা সকলেরই এক উদ্দেশ্য। কিন্তু, ইহা সাধন করিবার পথ ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়—কেহ বা ময়দা ছানিয়া লুচী গড়িতেছে, কেহ বা ভাতের গ্রাস মাখিতেছে, কেহ বা লাড়ু পাকাইতেছে, কেহ বা দধিতে চিড়া চিনি মাখাইতেছে, বলুনত এ সকল বিভিন্ন পন্থা কেন? শীত বায়ু হইতে শরীর রক্ষা করিতে বস্ত্র পরিধান করা একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু, কেহ মল্ মল্, কেহ ছিট, কেহ পাগড়ী, কেহ টুপি ইত্যাদি নানা জনের নানা পোষাক কেন? তাহারও আবার এক এক পাগড়ী প্রভৃতির সহস্র চেহারা কেন? যদি এক উদ্দেশ্যে একই প্রণালীতে কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে আশন বসন, ঘর দ্বার, খাট পালঙ্গ, প্রভৃতি সকল জিনিসেরই এক প্রকার চেহারা হওয়া উচিত। আজকালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞ সমাজে ইহার

উল্টা সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই। তাঁহারা একই বিষয় সহস্র প্রকারে সিদ্ধ করিতে পারিলেই আপন আপন বিদ্যাকে সার্থক মনে করেন। দেখুন ঘড়ী কত প্রকার, বাঁশী, পুতুল, খেলেনা কত রকমের, কাগজ কলম, পুঁথি পেন্সিলই বা কত ফ্যাসনের। এক প্রকারের বোতামে কি পিড়ান আঁটা যায় না? একই ঢংএর চেইনে কি ঘড়ী ঝুলান যায় না? একই প্যাটা-নের ছিটে কি গা ঢাকা যায় না! কিন্তু, হইলে কি হয়, আজকাল বিদ্বা-নেরা একটী কার্য্য সহস্র উপায়ে সাধন করিতে পারিলেই তাহাকেই বিদ্যার পরকাষ্ঠা মনে করেন। যে কাজই হউক, প্রত্যেকেই তাহাতে আপন আপন চতুরতা ও বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিবে ও নূতন নূতন পন্থা, প্রণালী ও ফ্যাসন আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবে। একবার সঙ্গীত বিদ্যার দিকে অবধান করুন। সঙ্গীতের মূল ভিত্তি এই যে কোনও প্রধান প্রণালীতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্বরে আরোহ অবরোহ করিতে থাকে। কিন্তু গাইয়ে বাজিয়ের প্রশংসা হইতেছে কেবল নূতন নূতন কায়দা ও ঢংঙ্গে। যে সেতারওয়ালা একই গৎকে ভরঘণ্টা বাজাইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন তান বাহির করিতে পারে, তাহারই অধিক বাহবা পড়িয়া থাকে। ইহা অসভ্য জঙ্গলী জাতির কথা যে, তাহারা সকলেই প্রায় এক প্রকার ঘর করে এবং একই প্রকার ধূতি কোমরে জড়াইয়া রাখে। অথবা ইহা পশুপক্ষীর ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা একই প্রকার রীতিতে জীবন কাটায় এবং একই প্রকার কুলায় ও খোঁদা বানাইয়া থাকে। অতএব যে দেশের অধিবাসীরা অল্পদিন যাবৎ লেখা পড়া শিখিয়াছ এবং অতি অল্প দিন হইল সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব পাইয়াছে, তাহারা যদি ভগবৎ প্রাপ্তিসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের কোনরূপ উন্নতি করিতে না পারে এবং এক স্থূল সাধারণ উপায়কে মোক্ষপথ বলিয়া অনুসরণ করে, করুক, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি? কিন্তু, যে ভারতবাসীরা অন্যান্য শাস্ত্র ও বিদ্যাকে কেবল ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় মনে করিয়াছেন, যাঁহারা উপাসনা শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই এক উদ্দেশ্য সাধনে বহু উপায় আবিষ্কার করা কি নিন্দার কথা?

যদি এক উদ্দেশ্যের একই উপায় ঠিক বুঝা যাইত, তাহা হইলে বৈদ্য কবিরাজ, হাকিম ডাক্তারেরা এক এক রোগের জন্য এক একটী মাত্র ঔষধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতেন। কিন্তু এ কিরূপ যুক্তি যে সামান্য জ্বরের

বিশ পঁচিশ রকমের ঔষধ হইতে পারে, আর সংসারক্ষেত্রের জন্মমৃত্যুরূপ মহাব্যাধির শুধু একটী মাত্র ঔষধ ও একটী মাত্র অনুপান হইবে! কেহ যদি সেই ঔষধ সেবনের ভিন্ন ভিন্ন অনুপান ও ভিন্ন ভিন্ন বিধি আবিষ্কার করিলেন, অমনি নব্যসম্প্রদায়ীদের সন্দেহজ্বর সান্নিপাত ক্ষেত্রে দাড়াইল!

(২) ইহা আপনারা কেমন করিয়া বুঝিলেন যে, সকলেরই এক উদ্দেশ্য? কেহ চায় সাযুজ্য, কেহ চায় সালোক্য, কেহ বা কৈঙ্কর্য্য কোনও সাংসারিক ব্যক্তি এই মাত্র অনুগ্রহ প্রার্থনা করে যে ন্যায় বিচারের দিন সকল কসুর মাপ হয়। কেহ চায় ঈশা সকলের জন্য শাস্তি পাইয়াছেন এবং জীবের কল্যাণের তরে জীবনদান করিয়াছেন অতএব আমাকে মুক্তি দাও'। কেহ বলে, 'দেহত্যাগের আমি বাসনা রহিত শুদ্ধ চেতন রূপ হইয়া যাই'। কেহ বলিতেছে, আমি ব্রহ্মরূপ বটি, কিন্তু যে অজ্ঞান মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া জীব যোনিপ্রাপ্ত হইয়াছি, কোনরূপে সেই অবিদ্যার মায়া বন্ধন কাটিয়া যাউক। ইত্যাদি শত শত বিভিন্ন উদ্দেশ্য কত তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু ইহার এক এক উদ্দেশ্যর যখন বহু পন্থা বিদ্যমান, না জানি বহু উদ্দেশ্যের কত অগণ্য অপরিমেয় উপায় হইতে পারে।

(৩) বেশ, এখন দেখা যাউক, সকলেই এক পথে চলিবে ইহা কতদূর সম্ভবপর। কোন লম্বা লম্বা বড় বড় দ্বীপে ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু, আমাদের ভারতবর্ষে কি সকলাংশের ও সকল বর্ণের সমান ভাব সম্ভব? এ সেই ভারত, যেখানে মাড়ওয়ারের মরুভূমি আফ্রিকাকেও পরাস্ত করিয়াছে; কাশ্মীরের শীত ইউরোপের দারুণ শীতকেও শীতল করিয়া দেয়; বনস্পতির রূপ দর্শনে কাবুল দেশের দাড়িম্বেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এবং খর্জ্জুর ফল সরমে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এ ভারতবর্ষ এমনি যে, ইহার এক পার্শ্বে ৪০০ হাত গভীর কূপে ডুবিলে তবে জলের মুখ দেখা যায়, অন্যত্র চাদরের পাশে ঘটি বাঁধিয়া কূপের জল তুলিয়া লওনা কেন! এ ভারতের একদিক পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, এক ক্রোশ ও সমতল ভূমি পাওয়া যায় না, এবং পর্ব্বতের অধিত্যকায় এমন সহস্র সহস্র বৃদ্ধ বাস করিতেছে, যাহারা জন্ম বয়সে কখনও নিম্নভূমিতে পদার্পণ করে নাই। পরন্তু অন্যদিক এমন যে বালকেরা ভূগোলে মাত্র পাহাড়ের কথা পড়িয়াছে! ভারতের অতি অল্প দূরে দূরেই ভাষার পরিবর্ত্তন, দেশের পরিবর্ত্তন, এবং আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন। যিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সভা সমিতি দেখি-

য়াছেন, তিনি জানেন, পঞ্জাবের সভাতে লম্বা লম্বা চোগা এবং ঘনদীর্ঘ দাড়ী বিশিষ্ট এমন পুরা পাঁচ হাতী সব জোয়ান সমবেত হয়, যে তাহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শুভ্র পাগড়ীর শ্রেণী দেখিলে বোধ হয় যেন কোন তড়াগের তীরে উপবনে হাজার হাজার কলহংস জমা হইয়াছে। রাজপুতনার সভাতে মাথায় রঙ্গ বিরঙ্গের পাগড়ী করিয়া গলদেশে পাটা ও আভরণ ঝুলাইয়া তুর্‌রা উড়াইয়া পাগড়ীর ঢিলে পেচ দোলাইতে দোলাইতে 'ছঁ, ছাঁ' বলিতে বলিতে একত্র হয়। বোধ হয় যেন কোন উদ্যানে বিচিত্র বসন্ত ঋতুর সমাগম হইয়াছে, তাই সহস্র সহস্র কুসুমের রঙ্গ বিরঙ্গ স্তবক ভরে টবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের চারা গাছগুলি যেন ভারাক্রান্ত হইয়াছে! এবার বঙ্গ দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যেখানে সভাতে, দেখিলে দয়ার উদ্রেক হয়, এইরূপ কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট খাটো পিড়ান ও লম্বা ধূতি পরিহিত বাবু বৃন্দ সম্মিলিত হন; তাঁহাদের সুচিক্কণ ঢেউতোলা কোঁকড়াণ কেশ ও উলঙ্গ মস্তকে সভাস্থল শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করে। সভা দেখিয়া মনে হয়, নানা বর্ণের প্রফুল্ল কমল পরিপূর্ণ এক সরোবরের উপরিভাগে কোটী কোটী ভ্রমর দল আসিয়া পড়িয়াছে ও তাহাদের দ্বারা কমল রাজি আচ্ছন্ন হইয়াছে। এমন ভারতে কি সম্ভব যে, সকলেই এক প্রকার প্রণালী অনুসরণ করিবে? শুধু দেশ-ভেদ কেন! জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আশ্রম-ভেদ, বয়োভেদ আদি কারণ সত্বেও কি সকলেই সমান অধিকারী বুঝিতে হইবে?

যদি একরীতিতে চলা সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাহারা একতা ও সমতার ধ্বজা উড়াইতেছে, তাহাদের সমাজে নিয়ম প্রণালী সবই এক হইত। আপনারা হয় ত ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয়াছেন। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মদের বড় বড় ব্রহ্মমন্দির আছে। ব্রাহ্মেরা খুব সমারোহের সহিত প্রতি বৎসর আনন্দ বাজার উৎসবের ঠাটবাঁধিয়া বসে। ৺রাজা রামমোহন রায় এই সমাজের স্থাপয়িতা। যাহারা এ দলে মিশিয়াছে, তাহারা প্রায়ই এই সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, ব্রাহ্ম সমাজের এক উদ্দেশ্য, এক অনুষ্ঠান, ও এক প্রণালী স্থির রাখিয়া একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ অথবা সমস্ত সংসারকে একতা ও সাম্যের সূত্রেঃবাঁধিতে হইবে। ভাল এখন দেখা যাক্ এই সকল একতার বেলুনেরা, নানামতের সারাংসগ্রাহী মানবদেহ বিশিষ্ট স্পঞ্জেরা এবং নিত্য নূতন উক্তি যুক্তি পূর্ণ উদরবিশিষ্ট পেটুক গণেশেরা কতদূর একতা বাড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কি পরস্পর মত বিরোধ কখনও হয় না?

কিছুদিন হইল ভাগলপুর জুবিলী কলেজে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরাজী ভাষায় মস্ত লম্বাচৌড়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি শত শত শ্রোতার সম্মুখে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন "It is easy to separate two fighting &" এত তাঁহাদের আচার্য্যেরই উক্তি। তারপর তাঁহাদের শাখা, উপশাখা, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় প্রভৃতি ও আদি ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ সমাজ, নববিধান তথা আর এক নূতন প্রকার উঠন্ত সমাজ, এই সাড়ে তিন শ্রেণী হইল। এখন বলুন, উহারা আপন সমাজই এক ভাবে চালাইতে পারিতেছে না এবং তাহাদের ঘরে ঘরে প্রতিদিনই সম্প্রদায় ভেদ ও মতভেদের সৃষ্টি হইতেছে। সুতরাং ইহা কবে এবং কিরূপে সম্ভব হইবে যে, সমস্ত ভারতবর্ষ এক পথে এক প্রণালীতে সাম্যানুযায়ী চলিবে?

আমাদের মুসলমান ভায়ারাও সকলের সঙ্গে খানা পিনা করিয়া বেশ বুঝিতেছেন 'আমরা সব এক সম্প্রদায়ের লোক এবং একই কায়দায় চলি।' কিন্তু, বস্তুতঃ ইহা কি প্রকৃত? আমরা যে মহরমে বড়ই ধুম দেখিতে পাই, যাহাতে সমগ্র হিন্দুস্থান একবার যেন উৎসাহে ও জাতীয়তায় কম্পমান এবং অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, যাহাতে গলি গলি তাজিয়ার সজ্জা বাহির হয়, নীল-পতাকায় নীরদজাল সমাচ্ছাদিত হয়। হায়, হায়, নিনাদে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হয়, প্রতি গৃহ হইতে কুসুম আসার ও পুষ্পমালিকায় তাজিয়া পরিপূর্ণ হয়, চারিদিকে কেবল গ্রামে গ্রামে সরবত বিলি হইতে থাকে। আপনারা কি মনে করেন, সকল মুসলমানই ইহাতে যোগদান করেন? মৌলবীরা বলেন, মহরম এক প্রকার বুতপরস্তী (পৌত্তলিকতা!) জ্ঞানী-লোকের ইহাতে যোগদান করা উচিত নহে। অন্যান্য সকলে এই মহরমের জন্য প্রাণ দিতেছে! পুনশ্চ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, এই চারি জাতি-ভেদ ইহাদের মধ্যে নাই কি? শিয়া সুন্নী এই দুই প্রধান বিরোধী সম্প্রদায় নাই কি? ইহার ভিতরেও কি সুফি ও এবং নিরানী উপসম্প্রদায় বর্ত্তমান নাই? ইহার অন্তর্গতও কি শত শত মতভেদ ও সম্প্রদায় ভেদ বিদ্যমান নাই?

এদিকে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ডঙ্কা মারিতেছেন "সাম্য, সাম্য, একপথ এক-পথ"। আপনারা কি মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এক মতাবলম্বী ও একই পথের পথিক? একথা ত চেতনাহীন বৃক্ষের পক্ষেও সম্ভব

নহে যে, সকল আমের এক চেহারা হইবে, অথবা সকল শাখা প্রশাখার একই রূপ আকার প্রকার হইবে। সুতরাং কেমনে যীশু মতাবলম্বীরা সকলে এক রীতি ও এক প্রণালী অনুধাবন করিবেন? তাঁহারাও মত-ভেদ ও উপাসনা ভেদে Protestant, Roman Catholic ও Greek Church আদি অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আস্তিকের কথা দূরমাস্তাম্, নাস্তিকদেরও নানা দল ও নানা মত। চার্ব্বাক, ম… মকাদি ভেদে তাহা-দেরও অনেক সম্প্রদায়। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভব যে, বুদ্ধিমানেরা এক-উদ্দেশ্য মানিয়েও অধিকারিভেদে রীতি, প্রণালী ও পন্থা ভেদ স্বীকার করিবেন না?

(ঘ) এখন এ প্রশ্নেরও মীমাংসা করা যাউক যে, সম্প্রদায় ভেদ দ্বারা ভারতের কোন অপচয় হইয়াছে কি না। আপনারা ইতিহাস শাস্ত্র পড়িয়াছেন, অতএব আপানাদের কাছে কোন কথা গোপন নাই। আপ-নারা জানেন, ভারতের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ, কলি আরম্ভে ভারতযুদ্ধ (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ)। ইহাতে ভাই ভাই একে অপরকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল, বনবাস দিয়াছিল ও অগ্নিতে দাহ করিয়াছিল। নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে হত্যা করিয়াছিল। সেই দিন হইতে ভারতে যে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা মুছাইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। যে দিন সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বনবাসে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ধর্ম্মদেব পবিত্র ভারতভূমি ত্যাগ করিয়াছেন, যে দিন পূর্ণ সভায় গুরুজন সমক্ষে ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাঠরাণী ভারতের রাজলক্ষ্মী স্বরূপা ভগবতী দ্রৌপদীর কেশ ও বস্ত্রাকর্ষণ করা হইয়াছে, নিশ্চয় জানিবেন, সেই দিন হইতেই ভারতের রাজলক্ষ্মীকে কে যেন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বাহির করিয়া দিয়াছে এবং সেই দ্রৌপদীর শোকে তপ্ত নিশ্বাস ঝড়ে ভারতের জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে। যে দিন পুত্র শোকে কাতর বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্যের গ্রীবাদেশে শাণিত অসি পতিত হইয়াছে, সেই দিনই ভারত মৃতবৎ হইয়াছে। যে দিন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত অনুকূল পক্ষীয়ের প্রতি তরবারি নিষ্কাশিত হইয়াছে, সেই দিনই ভারতের শত্রু জাগরিত হইয়াছে। যে দিন ভগবান্ কৃষ্ণ ও আচার্য্য বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য হইয়াছে, সেই দিনই ভারত উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। যে দিন পরমাচার্য্য পরমবীর, মহাত্মা ভীষ্মাচার্য্য শরশয্যায় পতিত হইয়াছেন, সেই দিনই ভারত

বক্ষে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। যে দিন সর্ব্বশেষ ধর্ম্মবীর মহারাজ পরীক্ষিতকে তক্ষকে দংশন করিয়াছে, সেই দিনই ভারত মূর্চ্ছিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়াছে। হে প্রিয় সভ্যগণ, তাঁহাদের ভাই ভাই কি সম্প্রদায় ভেদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? দ্রৌপদী ও দুঃশাসনের মধ্যে কি কোন মতভেদের বিসংবাদ ছিল? পরীক্ষিত ও ঋষিদের ভিতরে কি সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ছিল? ভাবিয়া দেখুন, এই সময় ভারতের পক্ষে কি ঘোর দুঃসময় ছিল। যবনেরা এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। কালী নামক এক যবন, যে তিন কোটী যবনের অধিস্বামী ছিল (কেন্দাহের যে ঘোর কাবুল না অপর কোন্ দেশের রাজা), এই সময়েই সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতে প্রবেশ করে এবং মথুরা পর্য্যন্ত আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিষম যুদ্ধ করে।

এই যবন প্রবেশের কারণ কি সম্প্রদায় ভেদ? অতঃপর যখন সে সেকন্দর সাহ ভারত আক্রমণ করেন, তখন ভারতীয় দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ তাঁহার কি কোন সহায়তা করিয়াছিল? না ভারত লুট করাইয়া দিয়াছিল? গজনীর সুলতান মাহমুদ অনেক বার ভারত লুণ্ঠন করেন। তিনি সোমনাথের মন্দির চূর্ণ করিলে কি কেবল শৈবদেরই দুঃখ হইয়াছিল, আর বৈষ্ণবেরা কি তাহার সাহায্য করিয়াছিল? রাঠোর বংশীয়েরা যে যবনকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং ভারতক্ষেত্র তাহাদের করে সঁপিয়া দিয়াছিল, তাহাতে কি সম্প্রদায় ভেদের কোন কথা ছিল? আপনারা কৃতবিদ্য হইয়াও কি বুঝিতেছেন না, ভারতের অবনতির কারণ কি? ভারতের অধোগতির কারণ—সংস্কৃত বিদ্যার অনাদর, স্বাধীনতা হারাইয়া পরাধীন হওয়া, বিদেশী বস্ত্রাদির প্রচলন, ও রেলাদি দ্বারা স্বদেশের সম্পত্তির বিদেশে রপ্তানি। ইহার ভিতরে কি এমন কোন অত্যাচার বা হীনতা আছে, যাহা সম্প্রদায়ভেদ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া ভারতের অবনতির কারণ হইয়াছে?

আপনারা কি কখনও ইতিহাসে পড়িয়াছেন যে, কোন বৈষ্ণব কোন শৈবের শিরচ্ছেদ করিয়াছে বা কোন শৈব কোন বৈষ্ণবের গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে?

বলিতে চান কি যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে শত শত যুদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহাতে লক্ষ লোকের মুণ্ডপাত হইয়াছে, সম্প্রদায়ভেদই তাহার

কারণ; কেন না, উহারা একমত হইলে কি আর যুদ্ধ হইত? এরূপ তুচ্ছ যুক্তি শুনিতে এক বালকেরও চিত্ত যাইবে না। প্রশ্ন হইতেছে, ভারতের সনাতনধর্ম্মের মতভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ লইয়া, তাহাতে জগৎশুদ্ধ মতভেদের কথা কি আছে? বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমানের এইসব যুদ্ধ মতভেদ ও সম্প্রদায় ভেদ লইয়া হয় নাই; কিন্তু মুসলমানদের লম্পটতা ও নির্দ্দয়তা-বিমিশ্রিত অনধিকার হস্তক্ষেপ ও বিমতে ধর্ম্মনাশ করিবার স্বভাব হেতু হইয়াছে।

মুসলমানী যুদ্ধে মতভেদই যদি কারণ হইত, তাহা হইলে হুমায়ুন ও কামরাণের মধ্যে ভ্রাতৃ বিরোধ হইত না। এবং আরঙ্গজেব ও তাঁহার সহোদরদিগকে নামে মাত্র সহোদর করিতেন না।

যদি বলেন, 'মহাশয় দেখা যায়, কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্র হইলেই দ্বৈতাদ্বৈত মত লইয়া তুমুল ঝগড়া বাধিয়া উঠে। এরূপ বিবাদ অতি খারাপ। যে বুদ্ধিতে এমন প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহাকে একবার ডাকিয়া ভাল ক'রে শুনাইতে হইবে। প্রিয় মহাশয়গণ, সভাতে পণ্ডিতেরা পরস্পর সদ্ভাব ও প্রণয়ে গদ্‌গদ্ হইয়া উপস্থিত হন, কিন্তু কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমোদে কিছু শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কের বিমল আমোদ লাভ করেন। পরে আবার যেমন আসিয়াছিলেন, প্রণয়ের সহিত সাদর সম্ভাষণ করত পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। ইহার বিবাদ কোন জায়গায়? এ যে কি, তাহা যে সকল বিশাল বুদ্ধি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

কেহ হয়ত বলিবেন, একজন অপরকে পরাস্ত করিতে যে যত্ন করেন, তাহাকেও ঝগড়াই বলিতে হইবে। কিন্তু এমন সব তর্কবাগীশরা হয়ত বলিয়া উঠিবেন, যাহারা ক্রিকেট, তাস, পাশা, দবা খেলে, কুস্তী করে ও গান বাজনার প্রতিযোগিতা করে, তাহাদিগকেও পুলিসে সোবাৰ্দ্দ করা হয় না কেন? (!!!)

ফলতঃ ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, সম্প্রদায় ভেদ নিতান্ত আবশ্যক। যেহেতু দেশভেদ ও জাতিভেদের অতিরিক্তও ইহা দেখা যায় যে, স্বভাবতঃ একজন একরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং অপর একজন দেশ জাতি বয়ঃ সকল বিষয়ে তুল্য হইলেও, অন্যরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, দুই সহোদর একত্রে পড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে

কাহারও বুদ্ধি অঙ্কে খেলে ভাল, অপরের মাথায় গণিত মোটেই প্রবেশ করে না, ব্যাকরণে তাহার নিত্য নূতন ভাব জুটে। কাহারও স্বাভাবিক প্রতিভা থাকে, আপনা আপনি কেহ না শিখাইলেও ছন্দোবন্ধে ভাবালঙ্কার শুদ্ধ কবিতা লিখিতে থাকে। কেহবা ষট্‌শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও দুই চরণ মিলাইয়া লিখিতে পারে না। প্রিয় সভ্যগণ, এইরূপে কেহ স্বভাবতঃই এমন আছেন, যাঁহার হৃদয়ে সহজেই জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং কেহ কোটী ছলা কলা করিয়া হার মানিয়া গেলেও এ বিশ্বাস টলিয়া কিছুতেই অন্য কথা মনে লাগে না। আবার কেহ বা এমন প্রকৃতির আছেন, যাঁহার হৃদয়ে জীব, ব্রহ্ম, জগৎ, এই তিনের ভেদজ্ঞান পাষাণে রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে, কখনই অপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপে কাহারও চিত্ত প্রভুর মন্দির হইতে এমন উপাদান লইয়া আসিয়াছে যে, কেবল সগুণোপাসনা—সাধনা করিতে পারে; কেহ কেহ বা কেবল নির্গুণের ধ্যানেই ডুবিতে পারে ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের কি এই ব্যবস্থা দেওয়া বাঞ্ছনীয় যে, গলাধঃকরণ হউক বা না হউক, বুঝিতে পার বা না পার, এক উপদেশ ও এক ধর্ম্ম কথা এক প্রণালীতে সকলকে মানিতেই হইবে? তাহা হইলে অতি অল্প সংখ্যক সাধু বাহির হইবেন, যাঁহারা ভগবানের তুষ্টি সাধনে সমর্থ। অবশিষ্ট সকলেই 'ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট'। কিন্তু আমাদের যে ধর্ম্ম সকল প্রকার প্রকৃতির লোকের জন্য, তাহাদের স্ব স্ব শক্তি ও বুদ্ধি অনুরূপ অনুষ্ঠান পদ্ধতি ধার্য্য করিয়া সেই সত্য ধর্ম্মেরই উপদেশ প্রদান করে, তাহার এ কেমন উদারতা ও দয়ালুতা বুঝিতে হইবে? কাম ক্রোধ আদি রিপুজয় করা, ইন্দ্রিয় পরায়ণ না হওয়া, এবং সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জব (সরলতা) প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট হইয়া পরোপকারকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করা ও তন্ময় হইয়া পরমাত্মায় নিমগ্ন হওয়া, ইহা সকলেরই এক উদ্দেশ্য। ইহারই সাধন দেশ কাল পাত্র, সমাজ, ও প্রকৃতি ভেদ অনুসারে করিতে করিতে আচার্য্যদিগের নিয়ম, বন্ধন ও শৌচ সদাচারের আবশ্যক পার্থক্য বশতঃ সম্প্রদায় ভেদের উৎপত্তি! পরমাত্মারইবা কেমন অপার করুণা যে, যেমন পথে ভগবানের আরাধনা করে, ভগবান্ তাহাতেই তাহার চিত্ত দৃঢ় করিয়া দেন, (যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ (গীতা) এবং যে তাঁহাকে যেরূপ ভজন করে, ভগবান্ তদ্রূপেই তাহাকে ফলপ্রদান করেন। (তং যথা যথোপা-

সতে তদেব ভবতি তদ্ধৈনান-ভূত্বাবতি, তস্মাদেনমেবংবিৎ সর্ব্বৈরেবৈতৈরূপাসীত সবং হৈতৎ ভবতি সর্বম্ হৈনমেতদ্ ভূত্বাবতি" শঃ, মং, ব্রাঃ, ২০ [বেদ ইহা স্পষ্ট উপদেশ করিতেছেন, তাহাকে লোকে যে ভাবে অর্থাৎ যেরূপে উপাসনা করে, তিনি সেইরূপ হইয়া সেবককে রক্ষা করেন—এ অধ্যায়ের আদিতে বিষসর্প মায়া আদির উপাসনা এবং অধিকারী বিশেষের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে এই সমস্তের উল্লেখ আছে।] বেদ স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা দেখাইয়া আরও অনেক সম্প্রদায় ভেদের মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন, যেমন, ছন্দোঃ উঃ "ও মিত্যেতদক্ষরমুপাসীত" "ওঁ" এই বর্ণের উপাসনা কর। "সয় এবং বিদ্বান্ আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" সূর্য্যকে ব্রহ্ম মানিয়া উপাসনা করি। "মনোব্রহ্মেত্যুপাস্তে" "বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" মন ও বাক্যকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করি। "যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি" নামকে ব্রহ্ম মানিয়া উপাসনা করি। "য এষোঽন্তরাদিত্যে দৃশ্যতে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষের উপাসনা করি (যাজুষমন্ত্র) "বাহুভ্যামুতৎে নমঃ" দ্বিবাহুর উপাসনা, "উভাভ্যামুততে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বতে" ধনুর্দ্ধারী দ্বিবাহুর উপাসনা "নমোঽস্তনীলগ্রীবায়" ইত্যাদি শত শত রূপে কেবল সেই পরমাত্মারই উপাসনা উপদেশ বেদ প্রদান করিতেছেন। অতএব বেদানুসারে ও যদি সম্প্রদায়ভেদ সিদ্ধ হয়, তবে তাহা অনর্থ নহে, প্রত্যুত উচিত।

সম্প্রদায়ভেদ প্রধানত দ্বিবিধ। কেহ আপন ভাবে প্রকৃতি অনুযায়ী সাধন পথে চলিয়া মোক্ষফল লাভ করে। অপরেরা চিত্তশুদ্ধিদ্বারা আপনাদিগকে উৎকৃষ্টতর উপাসনা পদ্ধতির যোগ্য করিয়া দেন। প্রথমের উদাহরণে কেবলাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আদি সম্প্রদায়। যাঁদের ব্যাসবিদ্যা অথবা শাণ্ডিল্যবিদ্যানুসারে উপায়স্বরূপ, তাঁহারা মার্গ-মোক্ষপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখে, এবং প্রকৃত অধিকারীর হাতে পড়িলে ও উপাসনা-চ্যুতি না হইলে মুক্তিলাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্কের রূপ কেবল স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ভিত্তি দৃঢ় করা। বাদানুবাদ শুনিলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের আপন আপন সম্প্রদায়ের উপর অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতি দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া যায় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি ঘনীভূত

হইয়া অবশিষ্ট থাকে। যদি বাদানুবাদ ও পরস্পর শাস্ত্রার্থের বিবাদ ব্যাখ্যা না হইত, তাহা হইলে আজকাল কলিকালের ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাস কৌতুকের দিনে ভক্তি সুধায় জগৎ প্লাবিতকারী রামানুজ বল্লভস্বামী প্রভৃতিকে কেহই মানিত না। কিন্তু শাস্ত্রার্থের প্রতি শত সহস্র দোষারোপ করিয়াও কেমন মহোপকার সাধন করিয়াছে, যে কেহ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যত দোষ আরোপ করিয়াছে, স্বপক্ষের লোকদের তাহার ততই উত্তর দিতে হইয়াছে। আজকাল ছেলে ছোকরারা কি দোষ ধরিবে? এসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক যতদূর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহা উহাদের স্বপ্নগোচরেও আসিবে না।

পরস্পর সাম্প্রদায়িকদের মধ্যে কিরূপ প্রীতি ও সদ্ভাব, তাহা বলিবার নহে! প্রশ্নোত্তর (তর্ক বিতর্কের) অর্থ এই রূপ করা যায়, কোন শিষ্যের যদি এই সন্দেহ হয়, তাহাকে কিরূপে বুঝাইবে? কোন নাস্তিক যদি একথা জিজ্ঞাসা করে, তাহার কি উত্তর দিবে? অথবা কখনও দৈবাৎ যদি তোমার মনে এরূপ খট্‌কা লাগে, মনকে বুঝাইয়া বিশ্বাস দৃঢ় করিতে কি উত্তর রাখিয়াছ? সুতরাং এবংবিধ বাদানুবাদ ক্ষতিকারক নহে বরং লাভজনক। অতএব সম্প্রদায়ভেদ অধিকারীদিগকে আপন আপন সাধন মার্গে অচল রাখে এবং অন্তে মোক্ষ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয়।

যাঁহারা বলেন, এক পথই সত্য, আর সব সত্য হইতে পারে না, সুতরাং মিথ্যা ও ভ্রমপূর্ণ, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন—কোন এক গন্তব্য স্থান উদ্দেশ্যে চারিদিকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যাত্রী ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া অবশেষে একই স্থানে পৌছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক 'ক' 'খ' আদি বর্ণ মালা ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় লেখে কিন্তু সকলেই 'ক' কে 'ক' এবং 'খ' কে 'খ'ই বলে। পড়িবার ও পড়াইবার একই ফল প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে একই তাল বাজান হয় ইত্যাদি। যদি বলেন, 'ইহাতে পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ কিছু দেখিতে পাই না, কিন্তু সম্প্রদায় ভেদে একে অন্যের ভিতরে নানারূপ বিরুদ্ধ প্রণালী দেখিতে পাই। বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা এক উদ্দেশ্যে একস্থানে কিরূপে পেঁছিতে পারে? কিন্তু আরও দেখুন, একই রোগের পাঁচ জন চিকিৎসক পাঁচ রকমে চিকিৎসা করেন। তাঁহারা প্রায় পরস্পর বিরুদ্ধ উপচার ও অনুপান ব্যবস্থা করেন। একজন শৈত্যপ্রধান অনুপান ছাড়িয়া সব উষ্ণ প্রধান ব্যবস্থা করেন; আর একজন

আসিয়া কেবল ঠাণ্ডা করিতেই উপদেশ দেন। কেহ মিষ্টি মুখে দিতে বারণ করেন, কেহবা মিষ্টাবলেহে সকল ঔষধ মিলাইয়া দেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সকল উপায়ই ব্যারাম আরোগ্য করিতে পারে। যদি এক অমৃত ও অপর বিষ স্বরূপ হইত, তাহা হইলে রাজাজ্ঞায় তাহা বন্ধ হইয়া যাইত।

অন্যান্য উপাসনা কোন এক প্রধান উপাসনার সহায়, একথা অতি সাধারণ এবং অতি স্থূল বুদ্ধিরও জ্ঞেয়। ইহার সীমার ভিতরেই মাতৃ পূজা, পিতৃ পূজা, গুরু পূজা, পৃথ্বীপূজা, মেঘপূজা প্রভৃতি। এতদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে পরে পরমাত্মার সর্ব্বপূজ্যতায় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। মূর্ত্তি উপাসক প্রথমে সমুদ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে পৃথ,ক পৃথ,ক দেবতা মানিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু, কিছুদিন পরেই, উহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন। অতঃপর এ সমস্তই সেই অনাদি অনন্ত পরমাত্মার কলাস্বরূপ জানিয়া সেই আনন্দময়ে চিত্ত ডুবাইয়া তাঁহার প্রেমপীযুষ পান করিতে থাকেন। এইরূপ সাধন পরম্পরার ইঙ্গিত বেদেও পাওয়া যায়, "নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।" "সমুদ্রোঽসি।" "যদেতন্মণ্ডলংতপতি।" "য এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ "সোঽগ্নিস্তানিয়জূংষি।" "যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্।" "সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি। বোধ করি বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল শ্রোতার পক্ষে এ সম্বন্ধে এই যথেষ্ট। কিন্তু কানপাত্‌লা, চঞ্চলমনা, পল্লবগ্রাহী তুচ্ছ লোকেরা ইহাকে অসার গল্প মনে করিবে, অথবা ইহা হইতে ১১ শ বিবাহ ও পঞ্চপতির অর্থ বাহির করিতে থাকিবে। এ প্রশ্নের আলোচনা এই পর্য্যন্ত। আপনারা মনে রাখিবেন, চতুর্থ প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা এ বিষয়েরও বিশেষ আনুষঙ্গিকও সমর্থক। কিন্তু সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক মনে করি।

এখন একবার ৭ম প্রশ্নটা টোকা দিয়া দেখা যাউক, তাহতে কি আছে।

(৭) "বেদ বিরুদ্ধ আচরণ কেন ?"

ছোট ছোট কথায় অনেক সময় গিয়াছে, সুতরাং আমি আপনাদের আর অধিক সময় নষ্ট করিতে চাই না।

আপনারা হয়ত জানেন বেদ ও বিষয়ে চারি প্রকারের কোন না কোন সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যথা—পূর্ণোক্তি, সংক্ষিপ্তোক্তি, অনুক্তি, ও নিষেধ।

(১) প্রথমতঃ কোন কোন বিষয় পূর্ণোক্তি হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে বেদে উক্ত হয়, যথা অগ্নিচয়নাদি। (২) দ্বিতীয়তঃ কোন কোন বিষয় সংক্ষিপ্তোক্ত অর্থাৎ সংক্ষেপে উল্লিখিত থাকে, কিন্তু পদ্ধতি আদিদ্বারা বিস্তৃত ভাবে লোক সমাজে প্রচলিত থাকে, যেমন উপনয়নাদি। (৩) তৃতীয়তঃ অনুক্ত, যে বিষয়ে বেদে কোন কথারই উল্লেখ নাই। যেমন সেতার বাজনা, পিত্তাল গৈলাই ইত্যাদি। (৪) চতুর্থতঃ নিষিদ্ধ, যাহা বেদ করিতে বলেন নাই; যথা, জুয়াখেলা, হিংসা প্রভৃতি।

আমাদের প্রশ্নকর্ত্তা কিরূপ বিষয়কে বেদ-বিরুদ্ধ বলিতেছেন?

(১) প্রথম বিষয়কে বেদ-বিরুদ্ধ কিরূপে বলিবেন? যাহা আনুপূর্ব্বিক বেদে উক্ত রহিয়াছে, তাহাও যদি বেদ-বিরুদ্ধ হয়, তবে বেদ-সম্মত কি হইবে।

(২) যদি যয়বিষয় অর্থাৎ সংক্ষিপ্তোক্তকে বেদ-বিরুদ্ধ বলেন এবং এইরূপ বেদ বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিতে বলেন, তাহা হইলে দিন রাত্রি আমরা যে সকল কাজ করি, অথবা করিতে পারি, সবই পরিত্যাগ করিতে হয়! যাহা হউক, যদি সংক্ষিপ্তোক্তি বেদ-বিরুদ্ধই হয় এবং তাহা বেদোক্ত মানিয়া আচরণকারীদের নরকগমনের দণ্ড ব্যবস্থাই হয়, তাহা হইলে জানি না, শ্রীল শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসী স্বামীজী দয়ানন্দ সরস্বতীর আজ যমদূত কালদূতের হাতে চৌরাশি নরক কুণ্ডে কি দুর্দ্দশাই হইতেছে; যে দয়ানন্দ কেবল "একাচমে তিস্রশ্চমে" প্রভৃতি সামান্য সামান্য সঙ্কেত পাইয়াই সমস্ত গণিত শাস্ত্রকে বেদোক্ত মানিয়া লইয়াছেন, যিনি বেদের কোন পৃষ্ঠায় আগুন ও ধোঁয়ার নাম পাইয়াই সমস্ত প্রকৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রকে বেদোক্ত মানিয়া লইয়াছেন এবং উহার এতদূর সম্মান করিয়াছেন যে, পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণের নামে রোজ রোজ তর্পণ পর্য্যন্ত করিবার বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। হায়, হায়, যিনি অপরাপর সাধু বিজ্ঞজনের স্বীকৃত প্রকৃত সিদ্ধান্তকে আষাঢে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু, স্বকপোলকল্পিত শুষ্ক, কদর্য্য ও অসার কল্পনাকে বেদোক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, না জানি, তাঁহার প্রতি পরম দেবের কিরূপ ক্রোধই হইয়া থাকিবে। হরি, হরি, জানি না তিনি কোন বেদ হইতে তর্পণ শিখিয়াছিলেন যে "ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তাম্" ইহার অর্থ করিয়াছেন, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদজ্ঞের নাম ব্রহ্মা, (স্মরণ রাখিবেন দয়ানন্দজীর মতে ব্রহ্মা বলিয়া কোন দেবতা নাই; তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের

সহিত তাঁহার তর্পণ করিলেই দেব তর্পণ হইবে। ইহার পর বলিতেছে, "মরীচ্যাদয় ঋষয়স্তৃপ্যন্তাম্" ইহার অর্থ এই যিনি ব্রহ্মার প্রপৌত্র মরীচিবৎ বিদ্বান হইয়া অধ্যাপনা করিবেন (দেখুন এখানে ইনি পৌরাণিকদের ন্যায় ব্রহ্মা ও তাঁহার প্রপৌত্র মরীচিকে মানিতেছেন। ছিঃ ছিঃ) তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও শিষ্যমণ্ডলী সহিত তর্পণ করিতে হইবে, ইহাই ঋষি তর্পণ। ইহাদের পিতৃতর্পণ এইরূপ "সোমসদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্" সোমসদঃ অর্থ পরমাত্মা ও প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত (তিনিই জানেন সোমসদের এ অর্থ কোন বেদে লিখিত আছে, অথবা ঠিকই হইয়াছে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানবেত্তা কলেজের পাশ করা বাবুদেরও ত কিছু খোসামোদ করিতে হইবে!)। ইত্যাদি আর কত বলিব? অগ্নিষ্বাত্তের অর্থ বলিতেছেন, তাড়িৎবিদ্যাবিৎ (তার ঘরের কেরানী বাবুদিগকেও কি পিতরঃ বলিবেন!) 'সোমপাঃ' অর্থ ডাকটর, আজ্যপাঃ অর্থটা একবার শুনুন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি যেমন তেমনই সম্মুখে ধরিতেছি—"যাঁহারা জ্ঞেয় বস্তুর রক্ষক এবং ঘৃত দুগ্ধাদি পান করেন তাঁহারাই আজ্যপাঃ" (ভাল, ভাল, বড় বড় বাবু ও জমীদারেরাও ইহাদের বাপদাদা হইলেন!)। আর এক পরিহাসের কথা দেখুন, তিনি তর্পণাদিকে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন এবং জীবিতদিগের তর্পণই কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন। অথচ একথা তাঁহার মস্তিষ্কে ঢুকিল না যে, সকল লোকে প্রতিদিন তর্পণের সময় বাহ্য বিদ্যার অধ্যাপক (Professor of physics) ও তার ঘরের বাবু কোথায় পাইবে? এবং তিনিই জানেন, মনগড়া কথা কি আন্দাজে বানাইবেন এবং সে কথার কি করি ও কি কি পড়িয়া বাবু-দের পা ধোওয়াইতে হইবে ও তাঁহাদের নামে অঞ্জলি দিতে হইবে। পুনরায় কাত্যায়নের নকল করিতেও চেষ্টা দেখা গিয়াছে। কোথায় ও বা নমঃ, কোথায়ও বা স্বধা উদোরপিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (যিনি এ সকল দেখেন নাই, ইচ্ছা হইলে সত্যার্থপ্রকাশ ৩য় সংস্করণ ৯৮ ও ৯৯ পৃষ্ঠা দেখিবেন)

এ বিষয়ে আমার শুধু এইটুকু বক্তব্য, যদি সংক্ষিপ্তোক্তিকে বেদ বিরুদ্ধ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে এই গোলমালের অধ্যায়ের কি নাম রাখিবেন?

(৩) তৃতীয়তঃ অনুক্ত বিষয়, যে সম্বন্ধে বেদ ভালমন্দ কিছুই বলেন নাই। কেহ কি বলিতে পারেন, বেদে অনুক্ত বিষয় করিতে নাই? যদি কেহ এরূপ বলিতে চান, তিনি, আর্য্যই হউন আর অনার্য্যই হউন, আর সব

চুলোয় যাক্, আপনা আপন অষ্ট প্রহরের কুল ক্রিয়া বেদের কোথায় লিখিত আছে, দেখাইয়া দিউন। সংসারে বেদানুক্তই অধিকাংশ কাজ। ফলতঃ একেইত হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্য বশত আপনারা সকল সুখ হইতে হাত ধুইয়া বসিয়াছেন, তার পর যদি সংক্ষিপ্তোক্তি ও অনুক্ত বিষয়ও বাদ দেওয়া যায়, তবে দেখছি এখানে সব বোম্বাইর কার খানা চলিতে থাকিবে—এমন কি সকল ক্রিয়া কলাপই বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৪) চতুর্থ, নিষিদ্ধ বিষয়। নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই যদি প্রশ্নকর্ত্তার মনোগত অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমিও ত তাই বলিতেছি। বেশ, এখন মূর্ত্তিপূজা নিষেধ, এ কথা বেদের কোথায় লিখা আছে, দেখাইয়া দিউন।

আমি দূর হইতে পল্লীগ্রামনিবাসীদিগকে সাবধান করিতেছি। ভাই সকল, সাবধান, সাবধান, সাবধান, আজকাল দেশে এমন লোক অনেক মাথা তুলিয়াছে, যাহারা সাহেবী হোটেলের 'মহাপ্রসাদ' নিজেরা উড়াইতেছে এবং আর পাঁচ জনেরও জিহ্বায় তুলিতে চেষ্টা করিতেছে! যদি কেহ ভগবন্মন্দিরে বসিয়া রামায়ণের প্রসঙ্গ শ্রবণ করে, তাহা দেখিয়া ইহাদের কলিজা জ্বলিয়া যায়, আর বলিয়া উঠে 'তোমরা বেদ-বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ কেন? সাবধান, উহাদের গেরুয়া বসন ও করঙ্গ তানপুরা দেখিয়া ভুলিওনা। তোমাদের ধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধে নহে। (জয় ধ্বনি)

প্রিয় সভ্যগণ, কোন কোন শঠচূড়ামণি নিরাকারবাদিনীশ্রুতির দুই এক শ্লোক আওড়াইয়া আকার কল্পনা শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া থাকে। এ কথার সমালোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে অন্য প্রশ্নোত্তরে করিয়াছি। কেহ ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে উপসংহারে বলেন, পাথরের প্রতিনিধি দ্বারা ভগবানের পূজা করিলে তাহার অপমান ও নিন্দা করা হয়। অতএব উহা বেদ বিরুদ্ধ। আপনারা স্বয়ংই দেখিতেছেন, বেদবিরুদ্ধ কোন বিষয়টী হইল এবং মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ভগবন্নিন্দা হইল কি না। কয়েকটী অবান্তরিক প্রশ্নের সমালোচনায় আমি ইহার উত্তর করিব।

কেহ কেহ কোথা হইতে এক বচন কুড়াইয়া আনেন "প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধীনাম্"; আর ধূয়া তুলিয়া দেন এই শোন নিষেধ বাক্য, প্রতিমাপূজা বেদবিরুদ্ধ সুতরাং তাহা করিও না, করিও না। বস্তুতঃ মহাশয়গণ, এ বচন কোন বেদের বচন নহে। যদি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কোন ঋষি

বাক্য হইত, তাহা হইলেও একথা আমি শিরোধার্য্য করিতাম। কিন্তু, পুরাণ সংহিতায়ও ইহার কোন খোজ খবর নাই। যাহা হউক, স্বীকারই না হয় করিলাম এ বাক্য প্রামাণ্য; কিন্তু, ইহার অর্থ এই মাত্র হয় যে, "প্রতিমাতে অল্প বুদ্ধিদের।" বেশ, এখন বলুন ইহার "কিং কেন লগ্নম্?"

যদি অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ অর্থই স্বীকার করা যায় যে প্রতিমাতে অল্প বুদ্ধিদের 'প্রেম হয়' (অনুরাগ হয়), বেশত সে ঠিকই, যে সকল শিশু ও বালক বালিকারা পুতুল খেলা করে, তাহাদের প্রতিমাতে প্রেম ও বিশ্বাস জন্মে এবং পরিপক্ক বুদ্ধিমানদের পরমাত্মায় জ্ঞান ও প্রীতি জন্মে। ঐশ প্রেম সাধন করিবার দ্বার স্বরূপ প্রতিমা কি না, তাহার কোন বিচার বিবেচনা ইহাতে পাওয়া যায় না।

যদি লম্ফ ঝম্ফ করিয়া মাটীতে দুই থাবা মারিয়া জোর করিয়া বলিতে চান, 'প্রতিমা পূজা হীন বুদ্ধিরা করিয়া থাকে।' এরূপ অর্থ করিলেও নিষেধ হইল না, বরং অল্পবুদ্ধিদের জন্য ব্যবস্থাই হইবে। এখন দেখা যাউক, কে কম বুদ্ধি এবং কে কম বুদ্ধি নহে। তাহাতে পুনরায় সেই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে, যাঁহারা সমাধি বলে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই অল্পবুদ্ধি। অতএব ইহাদের পক্ষে প্রতিমাপূজা বিধেয় ও বিশেষ আবশ্যক। যতই যত্ন করুন না কেন, তৈরী সাক্ষীতে কতক্ষণ মকদ্দমা টিকিবে? উহাতে আমার কথারই পোষকতা করিতেছে।

কলিকালের বেদজ্ঞ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীরও যত্নটা একবার দেখুন। তাঁহার সত্যার্থ প্রকাশের তৃতীয় সংস্করণ ৩১০ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিবেন, কেমন কঠোর বৈদিকের আদেশ লেখা রহিয়াছে—যেমন এক গালে মশা দংশন করিলেও যতক্ষণ উহাকে উড়াইয়া দিতে বেদ মন্ত্রের আদেশ না পাইবে, ততক্ষণ উড়াইবে না। কি বাল ভাষিতং! কি ছেলেমী কথা!! প্রথমে আপনারা নাম করিতেইত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু প্রশ্নোত্তর ছলে কি লেখা হইয়াছে, একবার শুনুন।—

সঃ প্রঃ—১১ শ সমুল্লাস, "কেবল নাম স্মরণ করিলেই কোন ফল হয় না। যেমন মিশ্রী মিশ্রী-বলিলেই মুখে মিষ্টি লাগে না এবং নিম, নিম করিলেই মুখ তিক্ত হয় না; কিন্তু, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিলে পরে মিষ্টত্ব কি তিক্তত্ব বুঝিতে পারা যায়। (প্রশ্ন)—নাম স্মরণ কি সর্ব্বথা মিথ্যা? পুরাণে নাম স্মরণের খুব মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (উত্তর) নাম

করিবার প্রণালী তোমাদের ঠিক নহে; যে ভাবে তোমরা নাম স্মরণ কর উহা মিথ্যা এবং বিফল। (প্রশ্ন) আমাদের প্রণালী কিরূপ? (উঃ) বেদ-বিরুদ্ধ। (প্রঃ) ভাল, আপনি না হয় বেদোক্ত নাম করিবার প্রণালীটী বলিয়া দিন। (উঃ) "নাম এই রূপে করিতে হইবে—যেমন'ন্যায়পর' ভগবানের একটী নাম। এ নামের অর্থ পরমাত্মা যে রূপ অপক্ষপাত হইয়া সকলের প্রতি ন্যায় বিধান করিতেছেন, সেই রূপে তাঁহাকে ধারণা করিয়া সর্ব্বদা ন্যায্য ব্যবহার করিতে হইবে; কখনও অন্যায় আচরণ করিবে না। এই প্রকারে কেবল একটী মাত্র নাম সাধনেও মানবের কল্যাণ হইতে পারে।" বলিহারি যাই কলির বৈদিক! মুকুন্দহরি নাম শুনিলে ইহাদিগকে বাঘে খায়, আর 'ন্যায়পর' এক বৈদিক নাম ইহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে এবং আপন আপন মনগড়া মতলবানুযায়ী শব্দ ইহাদের মহামন্ত্র হইয়াছে! একবার সরস্বতী জীর দেখা পাইলে জিজ্ঞাসা করা যাইত, কোন্ বেদের কোন্ মন্ত্রে ঈশ্বরের নাম 'ন্যায়কারী' লেখা আছে? মূর্দ্ধণ্য ষ ওয়ালা মিষ্‌রী নামে তাহাদের মুখ মিষ্ট হয় না কিন্তু 'ন্যায়কারী' নামে ডাকিলেই কি বিধাতা তাহাদের প্রতি ন্যায়ব্যবহার করিবেন? স্বামীজী একথা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, মিশ্রী বা লঙ্কার নাম করিলেই মুখে মিষ্টি বা ঝাল লাগে না; কিন্তু টক্ টক্ তেঁতুল, তেঁতুল বলিয়া উঠিলেই মুখ কেন টক হইয়া উঠে এবং জিহ্বা হইতে টস্ টস্ করিয়া (লাল) জল পড়িতে থাকে? প্রিয় মহাশয়গণ! যদি এক সামান্য পদার্থের নামেই এত শক্তি থাকিতে পারে, তবে মহামহিম জগৎ পাতা জগদীশ্বরের নামের যদি কোন অপূর্ব্ব সামর্থ্য থাকে, তাহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়?

যদি ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য বেদে উল্লেখ করিবার বিষয় না হইত, তাহা হইলে "ওমিত্যেতদক্ষর মুদগীথমুপাসীত" ইত্যাদি বেদ স্পষ্ট ভাবে কেন বলিতেছেন? এবং "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ", "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" এই সূত্রদ্বারা ভগবান্ পতঞ্জলিও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন ওঁকার ভগবদ্বাচক। উহা জপ করা ও তদর্থ স্বরূপ ভগবানের চিন্তা করা উচিত। পুনরায় যোগ শাস্ত্র ভগবান পতঞ্জলি ঐশ নাম জপ করিবার প্রত্যক্ষ ফল বলিতেছেন—"ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ"। সরস্বতী-জী প্রকৃতিবিজ্ঞান ও গণিতের কোথায়ও কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া সমগ্র বিষয় বেদোক্ত বুঝিয়া নিয়াছেন, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধীয় কথার বিশেষ উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার মস্তিষ্ক-

জ্বালা নিবারণ হয় না! তাঁহার নামস্মরণের পালা এখনও কি বাকী রহিয়াছে! যজুর্বেদের 'নমস্তে' অধ্যায়ে শত শত নামে ভগবানের স্তুতি করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও কি নাম করিবার কোন অধিক নিদর্শন চাই? বেশ, সঃ প্রঃ ৩য় সংস্করণ ১২ পৃঃ দেখুন "অথ ওঁঙ্কারার্থ (বি) উপসর্গ পূর্ব্বক রাজ দীপ্তৌ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া বিরাট্ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।" ইহার অর্থ দয়ানন্দজী বুঝিতেছেন এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্যরাই বুঝিতেছেন যে, স্পঞ্জেরহাড়ি দয়ানন্দের পেটে কি শোষণ করিয়া বসিয়াছে! ইহারা যে পাকা শিষ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কারণ, যেমন দয়ানন্দজীর শব্দ ধ্বনির বিশেষ বোধ ছিল, যে জন্য তিনি "কপাটান্ বধ্নীহি *" লিখিতেছিলেন, সেই রূপ ইহাদেরও 'ডভোল শব্দের' ন্যায় ফাকা আওয়াজ বৎ বুদ্ধি আছে, যদ্বারা সত্যার্থপ্রকাশের তৃতীয় সংস্করণের তৃতীয় প্রশ্নে লিখিতেছে—"ঈশ্বর ভিন্নস্যাঃ প্রকৃতেরুপাদনকারণত্বম্।" (জয়ধ্বনি)

ভাল সত্যার্থপ্রকাশের গ্রন্থকার মহাশয়, ইহার পর বেদে মূর্ত্তিপূজার নিষেধ কিরূপে দেখাইয়াছেন, তাহাও একবার শুনিয়া লউন। ইহাই আমাদের মুখ্য বক্তব্য বিষয়। সত্যার্থ প্রঃ ৩১২ পৃঃ।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽসম্ভূতি মুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ সংভূত্যা রতাঃ।। অঃ ৪০ মন্ত্র ৯
ন তস্য প্রতিমাঅস্তি। যজু।। ৩২। মং ৩।।
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। ৭
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেবব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদি সমুপাসতে।।২
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদি দমুপাসতে।।৩
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।৪

---

* দয়ানন্দজী সংস্কৃত বাক্য প্রবোধ নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহাতে প্রায় প্রতি বাক্যেরই ব্যাকরণ গত ও অর্থগত দোষ আছে। শ্রীযুক্ত ব্যাসজী উহার খণ্ডনে অবোধ নিবারণ নামক পুস্তক সেই সময়ে প্রকাশ করেন এবং স্বহস্তে দয়ানন্দজীকে উপহার দেন। আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিবাদ করা হয় নাই। তাঁহার সেই গ্রন্থেই দয়ানন্দজী "কপাটান্ বধ্নীহি" এই অশুদ্ধ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন।

যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫ (কেনোপনিষদ।

কিন্তু, উদ্ধৃতাংশের কোন কথারই এমন অর্থ হয় না যে, মূর্ত্তিপূজা দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করিতে নাই।

দেখুন প্রথম বাক্যে তাঁহাদেরই অর্থানুসারে ব্রহ্মোপাসনার পন্থা বিশেষের নিন্দা অথবা স্তুতি করা হয় নাই। প্রত্যুত যে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে প্রকৃতি অথবা লৌকিক পদার্থেই আবদ্ধ থাকে, তাহার নিন্দা করা হইয়াছে। (যদি উপায় স্বরূপ পদার্থ নিন্দার কারণ হইত, তাহা হইলে স্বামীজীর স্বীকৃত প্রণবাদিও টিকিত না)। মূর্ত্তিপূজকেরা সেই পরব্রহ্মেরই উপাসক, অপর কাহারও নহে, অতএব প্রথম নিষেধ অকিঞ্চিৎকর হইল। পরে উপনিষদের পাঁচটী শ্লোক। দেখুন সরস্বতী জী স্বয়ং কেন কঠ, মুণ্ড, মাণ্ডূক্য প্রভৃতি সকল উপনিষদকেই প্রমাণ স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু আমরা যদি কোন উপনিষদ্ বা ব্রাহ্মণাংশ হইতে পক্ষ সমর্থনের জন্য দু একটা বচন তুলিলাম, অমনি জ্বলিয়া উঠিলেন এবং শত প্রকারের ঠি ঠি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখুন, এই সকল শ্লোকে উপাসনা কিরূপে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। ইহাতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই রহিয়াছে। যাহার বিন্দুমাত্র সংস্কৃত বোধ আছে, সেও বুঝিতে পারে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইহার অর্থ কি। ইহার অর্থ এই যে 'তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। বলুন ত মূর্ত্তিপূজকেরা কি আর কাহাকেও ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া বসিয়াছে! কিন্তু সরস্বতী জীর চালাকীটা একবার দেখুন, এতটুকু বচনের, যাহা আপনারাও বেশ বুঝিয়াছেন; অর্থ লিখিতেছেন—

"তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম জানিও এবং তাঁহারই উপাসনা কর। তদ্ভিন্ন সূর্য্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি আদি জড় পদার্থের উপাসনা কখনও করিও না" ছি, ছি, ধিক্, ধিক্, জগতে এমন প্রবঞ্চক কে আছে যে স্বয়ং বুঝিতেছে, সংস্কৃতের প্রকৃত অর্থ কি, কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ অপর সকলকে ভুলাইবার জন্য যোড়া তালি দিয়া ভিন্ন বিপরীতার্থ বুঝাইয়া দেয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একবচনে বলিতেছে "যান্যনবদ্যানিকর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি" (নির্দ্দোষ কাজ কর্ত্তব্য অন্য কাজ নহে)। সরস্বতীজী কি ইহাকে নির্দ্দোষ কাজ বলিয়া বুঝিয়াছেন? তিনি নিজে লিখিয়াছেন,

"অসত্যমিশ্রং দূরতস্ত্যাজ্যম্"(মিথ্যা মিশ্রিত সত্য দূর হইতে বর্জ্জন করিবে)। অতএব ভ্রাতৃগণ, দয়ানন্দের সত্যার্থ প্রকাশও তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করুন— উহাতে মিথ্যার অংশ প্রায় একমণ হইবে সত্যের অংশ সেরেক আন্দাজও হয় কিনা সন্দেহ।

অনেকের হয়ত ভাবিয়া ভাবিয়া পেট ফাঁপিতেছে যে, মাঝখান থেকে একটি বাক্যের সমালোচনা কেন করা হইতেছে না। বেশ বাবা শুন শুন, তাহাও শুনিয়া লও। সে বচন এই "ন তস্য প্রতিমাঅস্তি"।এই বচনানুসারে দয়ানন্দজী এবং দয়ানন্দ সম্প্রদায়িকেরা মূর্ত্তিপূজাকে বেদ-বিরুদ্ধ বলেন। কিন্তু একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ বচনের কি এই অর্থ হয় যে, মূর্ত্তিপূজা করিতে নাই? বচনে শুধু একমাত্র বলিতেছে যে তাঁহার প্রতিমা নাই। ইহাতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়াংশ বিশেষের উপাসনা পদ্ধতির কি কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে? তাহার প্রতিমা নাই কিন্তু অভিপ্রায় হইলে আমি সেই অপ্রতিমকে প্রতিমাদ্বারা আরাধনা করিতে চাই। আমাকেও কি শ্রুতি নিষেধ করিবেন? আমি তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া সাকার দ্বারা পূজা করি, অমূর্ত্ত বলিয়া মূর্ত্তি দ্বারা আরাধনা করি, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া একদেশ দ্বারা অর্চ্চনা করি, তথাপি যদি শ্রুতির এই অর্থ হয় যে তাঁহার প্রতিমা অর্থাৎ মূর্ত্তি নহে। তা হলেও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ইহাতে দ্বারভূত বা উপায় স্বরূপ পদার্থের ত কোনই কথা নাই।

একবার বিচার করিয়া দেখুন এখানে প্রতিমাশব্দের অর্থ কি। প্রতিমা অর্থে দাড়ীপাল্লা, বাটখারা, গজ, পরওয়ানা ইত্যাদি অর্থও হইতে পারে। যেহেতু 'মা' ধাতুর সাধারণতঃ মাপকরা অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়। যদি সেইরূপ কোন অর্থ এখানে করা যায়,তাহা হইলে এতদ্বারা মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ হইবে না। সুতরাং আমি এ অর্থ লইয়া নাড়া করা অনাবশ্যক মনে করি।

প্রতিমাশব্দে মূর্ত্তি এবং উপমা ও বুঝায়। এখন দেখা যাউক, এস্থলে ইহার কোনটী সঙ্গত।

প্রতিমা অর্থ উপমা হয়, একথার প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক করেনা। যেহেতু যাঁহাদের সংস্কৃত বোধ আছে, তাঁহারা ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। তথাপি অতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতের পদে ইহার প্রয়োগ দেখিয়া লউন। বাল্মীকি রামায়ণ বনবাস প্রকরণে—

"স তন্নিয়োগাৎ ধর্ম্ম সত্যবাদী সত্যাং প্রতিজ্ঞাং নৃপ পালয়ংস্তে।
ইতো মহাত্মা বনমেব রামো গতঃ সুপাশুপ্রতিমানি হিত্বা।"

ইহার অর্থ এই যে, অতুল অপ্রতিম সুখ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বন-গমন করিলেন। এরূপ অর্থ কখনই নহে যে, রামচন্দ্র, যে সুখের মূর্ত্তি হইতে পারে না, এরূপ সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন।

পুনঃ মহাভারতের নলোপাখ্যানে "রূপেণা প্রতিমো ভুবি" এ বাক্যাংশটী নল রাজার বিশেষণ। অবশ্য ইহার এই অর্থই হইবে যে, নল রাজা এমন রূপবান পুরুষ ছিলেন যে, ধরাতলে তাঁহার সাদৃশ্য ছিল না। যদি বলেন, তাঁহার মূর্ত্তি (!) ছিল না, তবে দেখিতেছি "কর্ণ স্পর্শে কটী সঞ্চালন" বৎ অর্থ হইতেছে। কারণ ছবি, পট, মূর্ত্তি, এ সকল রূপবান্ পুরুষেরই হইয়া থাকে। নলচরিতে একথাও সুস্পষ্ট রহিয়াছে "ইতিস্ম সাকারূবরেণ লেখিতং নলস্য চ স্বস্য চ সখ্যমৈক্ষত।" অর্থাৎ নলদময়ন্তী উভয়ের চিত্রপট চিত্রিত হইতেছিল, আর দময়ন্তী তাহাতে নলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বীক্ষণ কবিতেছিলেন। ইত্যাদি।

মন্ত্রটী এই "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ," তাঁহার প্রতিমা নাই যাঁহার যশ খুব বেশী। যেমন শুনিয়াছি, ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছে। কেননা দয়ানন্দ ত ভাষ্যকার মানিবেন না। শব্দ দেখিয়া যে অর্থ সুগম ও সহজ বোধ হইবে, প্রস্তাবের অনুকূল ও নিরাপত্ত্য হইলে তাহাই গ্রাহ্য হইবে। আপনারা একথা বেশ ভাবিয়া দেখুন, যে মহা যশস্বীর মূর্ত্তি হইতে পারে না, কি মহাযশস্বীকে একথা বলা শোভা পায়, যে 'আপনার ন্যায় দ্বিতীয় কেহ নাই'? যদি মূর্ত্তি কল্পনাই যশস্বীদের যশের হানি করিত, তাহা হইলে যতসব রাজা মহারাজ, লাট, পণ্ডিত, এমন কি স্বামী দয়ানন্দের যে প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছে, উহা চন্দ্রকীর্ত্তির স্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই বচন ও প্রসঙ্গ স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনারা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন, এখানে বেদের তাৎপর্য্য এই বটে।

যজুর্বেদ সংহিতা ৩১ অধ্যায়ে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বশক্তিমত্তা ব্যাপকতা ও রূপবত্তার বর্ণনা করা হইয়াছে। "পুরুষ এব" এতদ্বারা জগৎ হইতে অভিন্ন সেই পুরুষোত্তমের উল্লেখ করা হইয়াছে। "ততো বিরাট্" এই মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে বিরাট পুরুষেরও কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে। পরে কয়েকটী সূক্তদ্বারা সৃষ্টিতন্মূলক, ইহা উপপাদন করা হইয়াছে। 'বেদাহমেতৎ' এ মন্ত্রে তাঁহার জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে, "যো দেবেভ্য" এ মন্ত্র পড়িয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইতে দেখাইয়াছে। ( এখন

৩২ অধ্যায়ে চলুন ) "তদেব" মন্ত্রদ্বারা দেখান হইয়াছে, তিনি সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই বসু অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব স্বরূপ। তারপর 'সর্ব্বে নিমেষা' এই মন্ত্রদ্বারা তাঁহার নিরবচ্ছিন্নতা ও ব্যাপকতার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ" এই মন্ত্রদ্বারা তাঁহার অতুলনীয়তা দেখান হইয়াছে! এ প্রস্তাব হইতে আমার শ্রোতৃবর্গ স্পষ্ট বুঝিবেন যে 'যাঁহার এতদূর যশঃ, তাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় কেহ নাই' ইহা ভিন্ন এ সূত্রের অন্য অর্থ কদাপি হইতে পারে না।

দয়ানন্দ ও দয়ানন্দীরা মূর্ত্তিপূজা বেদ বিরুদ্ধ প্রমাণ করিতে যত বচন প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল দন্ত কট্‌মটিসার প্রমাণ হইল, অতএব আপনারা আমার বাক্য গ্রহণ করুন। নচেৎ উত্তর দক্ষিণ উভয় পথই খোলা রহিয়াছে যে দিকে মন চায় চলিয়া যাউন।

(করতল ধ্বনি ও জয় ধ্বনি)

অধুনা এ প্রশ্নটীর ও মীমাংসা করা যাউক।

(৮) "প্রমাণ কি ?"

কিসের প্রমাণ ? মূর্ত্তিপূজা হয় কি না, তাহার প্রমাণ যদি এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি বলিতেছি "প্রত্যক্ষ প্রমাণ"। যখন ইচ্ছা হয়, কোন দেব মন্দিরে যাইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন যে মূর্ত্তিপূজা হয় কি না। কিন্তু না, যদিও খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না, হয়ত প্রশ্ন কর্ত্তার ভিতরের অভিপ্রায় এই যে "মূর্ত্তিপূজা করা আবশ্যক, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ?"। ভাল তাহাই হউক। কিন্তু আমি ইতি পূর্ব্বে কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরে প্রতি কথায় ইহা প্রমাণ করিয়া আসিতেছি যে, মূর্ত্তিপূজা ব্যতীত হঠাৎ একলম্ফে ব্রহ্মে লীন হওয়া প্রায় অসম্ভব। এবং যাঁহারা মূর্ত্তিপূজার সাহায্য ব্যতীত ও পরমহংসত্বে উপনীত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে আমার কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু অপর সাধারণের পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। একথা ও সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, স্বচ্ছ হৃদয়ে ও সরল প্রাণে মূর্ত্তিপূজা করিতে দেখিলে ভগবান নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইবেন। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নির্গুণ মার্গ অপেক্ষা এ পথ অতি সহজ, শীঘ্র ও নিশ্চিত ফলপ্রদ। ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বড় বড় কঠিন নির্গুণী সাধকদেরও পরিশেষে হার মানিয়া সগুণোপাসনার শরণ লইতে হয়। অতএব এখন আর কি প্রমাণ চান ? আপনারা সকলে যুক্তিবাদী,

আমরাই কেবল গ্রন্থ প্রমাণের পক্ষপাতী। এত যুক্তিদ্বারা কত প্রবল অনুমানের ভিত্তি দৃঢ়করা যায়; কিন্তু, আপনারা কি আবার যুক্তি ও অনুমানের প্রমাণ স্বীকার করিতে রাজি নহেন? এমন মত কোথায় আছে, যাহাতে বিশ্বাসকে মূলভিত্তির স্থান দেওয়া হয় নাই? খৃষ্টমতাবলম্বীরা বিশ্বাসেই বিশ্বাস রাখেন। মুসলমানেরা ও ইমানের উপর নির্ভর করেন। অতএব প্রশ্নকর্ত্তাদিগকে আমি অবিশ্বাসী ও বেইমান কেন বলিব? এবং যখন "বিশ্বাস: ফলদায়ক:'' সিদ্ধান্ত হইতেছে, তখন আচার্যাদের উক্তিতে বিশ্বাস, গুরুবাক্যে বিশ্বাস, সদাচারে ও স্বসম্প্রদায়ের মর্য্যাদায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ফল লাভ হইবে, ইহা যদি 'বিশ্বাস: ফলদায়ক:' মতাবলম্বীদের আপনা আপনি ব্যাপ্তিগ্রহ হয়, তবে অনুমানই প্রমাণ।

পুনশ্চ সদাচারে কম প্রমাণ কি? "বেদ: স্মৃতি: সদাচার: স্বস্য চ প্রিয়মাত্মন:," ঋষিদের উক্তি এই রূপ। যদিও আমি বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মপ্রেম সবই মূর্ত্তিপূজার অনুকূলে দেখাইয়া গিয়াছি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সদাচার অতি প্রবল। ইহার উপর জগতের সকল ব্যবহার নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষে কি মূর্ত্তিপূজা সমর্থনের জন্য আচার ব্যবহার খুঁজিতে হইবে? ভারতে প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর গ্রন্থ, ও প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর মন্দির নিয়ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কোন কোন ছোক্‌রা বাবু জিজ্ঞাসা করিয়া উঠেন, 'আচার আবার কি মহাশয়, ? কোন কোন দেশে অতি খারাপ প্রথা পরিপাটীর সহিত প্রচলিত রহিয়াছে।'' কিন্তু এরূপ প্রশ্ন অতি ছেলেমী বুদ্ধির। কেননা আমিত সদাচারকেই অনুকরনীয় বলিতেছি, কদাচার নহে। সুবিদ্বান, জ্ঞানী, সাধু, মহাত্মা, সদসৎ বিবেচকদিগের আচারই গ্রাহ্য—মাতাল শুঁড়ী, চোর জুয়াচোর, খুনী গুণ্ডা, ইহাদের আচারকে সদাচার বলা যায় না এবং তাহা সাধন করিবার বা প্রমাণের উপযুক্ত ও মনে করি না।

বেদে অনুল্লিখিত বিষয়ে শ্রুতি বেদের তুল্য সম্মান পান। বেদ, শ্রুতি উভয়েই অনুক্ত বিষয়ে সদাচারই বেদের সমকক্ষ। কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয়ে নহে। শত শত দূষিত প্রথা 'নিষিদ্ধ' গণ্ডির ভিতরে পড়িতেছে, তাহা কখনই প্রামাণ্য বা গ্রাহ্য হইবে না। ভাল, মূর্ত্তিপূজার অল্প একটু ইঙ্গিত যদি বেদে পাওয়া যায়, এবং আনুপূর্ব্বিক ব্যবস্থা যদি ব্যবহারে ও সদাচারে

দেখা যায়, অথচ বেদে যদি ইহার নিষেধ বা নিন্দাবাদ না থাকে, তাহা হইলে আর কি প্রমাণ চান ?

সদাচারের লক্ষণ ভগবান্ মনু বলিতেছেন—"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো * * * পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ * * সদাচার উচ্যতে।" ঠিক এই প্রকার সদাচারে মূর্ত্তিপূজা সমাদৃত। এবং কেবল মূর্ত্তিপূজা কেন, তীর্থ যাত্রাদিও এখানকার চিরন্তন সদাচারের তালিকাভুক্ত।

মঙ্গলাচরণ অধ্যায়ে মহর্ষি কপিল স্বয়ং লিখিয়াছেন "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ।" আমি আর কাহাকেও কিছু বলি না। কিন্তু, আমাদের সমাজী ( দয়ানন্দ পন্থী ! ) মহাশয়েরা ত সূত্রের প্রামাণ্য গ্রাহ্য মনে করেন ; তাঁহারা দেখিবেন কপিলাচার্য্য শিষ্টাচারের প্রতি কতদূর আদর ও সম্মান দেখাইয়াছেন। পরন্তু অনেক প্রধান প্রধান টীকাকার ও ভাষ্যকারদিগের মত এই যে "বেদের সকল অংশ" পাওয়া যায় নাই। এমন কি "সহস্র শাখং সাম" প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু সেই সহস্র শাখার মধ্যে কেবল মাত্র ৩ তিন শাখা পাওয়া গিয়াছে। আচার্য্যেরা বলেন, যদি সদাচারে কোন বিষয়ের ব্যবস্থা পাওয়া যায় এবং যদি শ্রুতির প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রুতির সে অংশটুকু নষ্ট হইয়াছে। এ জন্য অনেক পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে "মঙ্গল মাচরনীয়ং সদাচারনুমিত শ্রুতি বিরোধ কর্ত্তব্যতাকত্বাৎ" অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য ; কেননা সদাচার দ্বারা অনুমিত শ্রুতি ইহার বিধান করিতেছেন। সদাচারের প্রশংসা মন্বাদি মহর্ষিরাও করিয়াছেন—"যে নাস্য পিতরোযাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ নরিষ্যতে"। ইহা এমন কথা নহে যে যাহার ইচ্ছা চিন্তা না করিয়াই ঠাট্টা মস্করা করিয়া উড়াইয়া দিবে। ইহা গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বলুন ত, অষ্ট প্রহরের চাল চলন যে সদাচারের অন্তর্গত, তাহা যদি সব আনুপূর্ব্বিক কোন মূল ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায়, তবেই পালন করিতে হইবে, নচেৎ নহে ; এই কি আপনাদের নিয়ম ? যদি না হয়, তবে অনর্থক এত দন্ত কড়মড়ি ও কথা কাটাকাটি কেন ? আর যদি প্রকৃতই এরূপ কড়াকড় নিয়ম হয়, তবে আপনাদের রাত্রি দিন ২৪ ঘণ্টার আচার ব্যবহারের ব্যবস্থা বেদ হইতে বাহির করুন ! আমি আপনাদিগকে আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, দয়ানন্দ স্বামীজীও ( সত্যার্থ প্রঃ ৬০৫ পৃঃ ) আপন সদাচারের অবশ্য করনীযতায় কিছু জোর দিয়া গিয়াছেন।

যদি ও 'টিড্‌ঢণঞ্‌' বিদ্ (?) পণ্ডিতদের একথা ভাল লাগেনা, তবুও সর্ব্বসাধারণের ইহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য যে, মূর্ত্তিপূজা প্রকৃতিসিদ্ধ এবং মানব স্বভাবানুযায়ী। আজ কাল বিজ্ঞান-বলে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ করা হইয়াছে যে, মনুষ্যের মস্তিষ্কে এমন সামার্থ্য নাই যে, নির্গুণের ধারণা করিতে পারে। অতএব স্ববিচার বিষয়ে যদি তাদাত্মাধ্যাস করিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তর্ক বিতর্ক ত্যাগ করিতে থাকে, তাহা হইলে ভগবন্ময় হইতে পারে। এই স্বাভাবিক উচ্ছাস পরিস্ফুট করিতে পুরা কালে নিখিল সংসার মূর্ত্তিপূজা করিতে। আজ পর্য্যন্তও কোন কোন দ্বীপান্তরে মূর্ত্তি-পূজার নিদর্শন স্বরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমন্দির দৃষ্টিগোচর হয় এবং দ্বীপ-বাসীরা অগ্নিতে কিছু হবন করিয়া তাহা ঈশ্বরার্পণ করা হইল মনে করে। পার্শীরা জিন্দাবস্তার বিশ্বাসী। তাহারা প্রসিদ্ধ অগ্নিপূজক। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী-দের রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিখ্যাত মূর্ত্তিপূজক। যদি ভগবত্তুষ্টি সাধনে মূর্ত্তিপূজাকে প্রকৃতিসিদ্ধ স্বীকার না করেন, তবে বলুনত সমস্ত সংসারকে কে শিখাইয়া ছিল যে, মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে? মুসলমানেরা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী। কিন্তু, এই বৃত্তি ভুলাইয়া দিতে তাহা-দের এত হৈ চৈ ও আকাঙ্ক্ষা উদ্যোগেই প্রমাণ করিতেছে যে, মূর্ত্তি উপা-সনা স্বভাবসিদ্ধ। উহারা কোন প্রকারে সেই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসকে সংযত ও নষ্ট করিয়াছে। ইহাও শ্রুত আছে যে কোনও সময়ে ইহাদের মধ্যে শুধু চিত্র ও মূর্ত্তি গড়িতে নিষেধ ছিল। কিন্তু হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস কোন পদার্থের উপর স্থির করিত। অন্যদিকে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত না হইলে অক্ষর মানা বা লিপি বিদ্যাকে চিত্রপট করিল এবং অক্ষর এত যত্ন ও পারিপাট্যের সহিত লিখিতে আরম্ভ করিল যে 'সুন্দর লেখাই' এক স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইল। বর্ত্তমান সময়ে অপরাপর খৃষ্টধর্ম্মীরা অত্যন্ত চিত্ত দমন করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরের সাকারতা তাঁহাদেরও চক্ষের নিকট উদ্ভাসিত হয়। দেখুন, তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থে কি লিখিত রহিয়াছে।—"And in the midst of the &c, &c, &c wheels as burning fire &c. Daniel."

"13. And in the midst of the seven candlesticks one like unto the son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with golden girdle.

15. His head and his hair were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

16. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace and his voice as the sound of many waters.

17. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not I am the first and the last.

18. I am he that liveth and was dead; and behold I am alive for ever &c."

*Revelation.*

"9. I beheld till thrones were cast down and the Ancient of days did sit, whose garment was white as snow and the hair of his head like the pure wool: his throne was like the firy flame and his wheels as burning fire &c."

*Daniel.*

এখন একবার তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পাত করুন, যাহারা অতি জঘন্য, অসভ্য ও বন্য জাতি বলিয়া পরিচিত। তাহারা কখনও কোন পর্ব্বত শৃঙ্গের পূজা করিতেছে, কভু বা কোন বৃক্ষের গাত্রে সিন্দুর লেপন করিতেছে এবং গীত বাদ্য নৃত্য দ্বারা বৃক্ষের তুষ্টি সাধন করিয়া ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই নিখিল সংসার কাহার শিষ্য? কে এই জগৎ শুদ্ধ লোককে মূর্ত্তিপূজার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিল? যাহারা মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী, তাহারা প্রকৃতিসিদ্ধ ভক্তি মার্গকে কৃত্রিম উপায়ে জোর-জবরদস্তিতে দমন করিয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্ব তাহাতেই যদি সে যদি প্রকৃতিসুলভ ভাব নিচয় সুসংযত ও সুনিয়মে পরিচালিত করিয়া সুন্দর সুফলপ্রদ ও উৎকর্ষযুক্ত করিতে পারে। যেমন প্রকৃতিসিদ্ধ রিরংসাকে বিবাহাদি নিয়মে আবদ্ধ করা হইয়াছে, স্বভাবসিদ্ধ সংগীতোচ্ছাকে সুর লয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করা হইয়াছে সেই রূপ বিশেষ বুদ্ধিমানেরা ভক্তির প্রাকৃতিক প্রবাহকেও বিশেষ নিয়মাবদ্ধ করিয়াছেন। এবং এই রূপেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

স্বামী দয়ানন্দজী এই স্বভাবসিদ্ধ কথার কেনই বা বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। তিনিত প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজের ঠিকা ( Contract ) চুক্তি লইয়াছেন! স্বামীজী তাঁহার স: প্র: লিখিয়াছেন "প্রসূতির দুধ ছয়দিন পর্য্যন্ত শিশুকে খাওয়াইবে, পরে ধাত্রীর দুধ খাওয়াইবে। দুধ বন্ধ করিতে স্তনের

বোঁটায় এরূপ কোন ঔষধের প্রলেপ দিবে, যাহাতে দুগ্ধ স্রাব না হয়। এরূপ করিলে প্রসূতি দ্বিতীয় মাসেই পুনরায় যুবতী ভাব প্রাপ্ত হইবে।” (তৃতীয় সংস্করণ ২৮ পৃঃ দে)। বিশ্বসংসারে সকলেই জানে পরমাত্মা গর্ভকোটরে যে শিশুকে গর্ভকোটরে সর্জন করেন, তাহারই জন্য জন্মের পূর্ব্ব হইতেই অমৃত কলসী ভরিতে থাকেন। যতদিন বালক ভূমিষ্ঠ না হয়, ততদিন মাতৃস্তনে ক্ষীরের সঞ্চার ও পূর্ণ হয় না। যেমনি শিশু উৎপন্ন হইল, তৎক্ষণাৎ জননীর বক্ষে স্নেহসুধা আপনা আপনি ক্ষরিত আরম্ভ করিল! কি আশ্চর্য্য! শিশু ও কেহ না শিখাইতেই মুখের কাছে স্তন্যাধার অসিবা মাত্র চুষিতে আরম্ভ করে। মা একদিন শিশুকে দুধ না দিলে বক্ষ টন্ টন্ করিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হন এবং বালককে দুধ খাওয়াইতে কেহ বাধা দিলে কান্দিয়া আকুল হন। এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ কথা বারণ করিতে এবং তজ্জন্য তর্ক বিতর্ক করিতে পণ্ডিতজী বদ্ধপরিকর। স্ত্রীর স্তন ঝুলিয়া না পড়ে এবং কঠিন থাকে, তাহা হইলে স্বামীজী'র পেট ভরিবে। স্তনন্ধয় শিশু মাতার দুধ পাউক আর না পাউক, কিন্তু স্ত্রীর যৌবন বজায় থাকুক এ সব যৌবন জীবিনী বেশ্যাদের স্বভাব কুলবধূদিগকে শিক্ষা দেওয়া হই-তেছে। অথবা স্বামীজী ঠিকই বুঝিয়াছেন, যদি যৌবনের শোভা না থাকিবে। তাহা হইলে ১১ পতি কিরূপে হইবে এবং কিছু দিনের তরে স্বামী বিদেশে গেলে চট্ করিয়া অন্য পতিই ·বা কিরূপে নিয়োগ করা যাইবে? ভাল, কিছুত বাহার চাই যাহাতে লোকের মন মজিবে। (জয় ধ্বনি)

আমরা তিন চারিটী প্রমাণের বলেই সকল কাজ করি, কিন্তু স্বামীজ আট প্রকার প্রমাণ দাবী করেন। (সঃ প্রঃ ৬০৫ পৃঃ)। পরন্তু অতি আশ্চর্য্যের কথা যে বিচার করিতে যাইয়া আট প্রকার প্রমাণের বোঝা মাথায় তুলিয়াছে, তথাপি মূর্ত্তিপূজা প্রমাণ করিতে অসমর্থ রহিয়া গেল! অষ্টপ্রমাণ যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব।

প্রথমতঃ অনুমান অনেক প্রকার দেখাইয়াছি, যাহা সংস্কৃত প্রণালীতে অথবা ইংরেজী রীতিতে আপনারা যথাক্রম সমাবেশ করিয়া লইবেন। অথবা জিজ্ঞাসিলে আমি বলিয়া দিব। ইহাতে ঐতিহ্য প্রমাণ ও স্পষ্টই রহিয়াছে। কারণ, ঐতিহ্য তাহাই যাহা আবহমান কাল লোক পরম্পরা সকলের বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমি রহিয়াছে। যেমন কোন গ্রামে কোন বৃক্ষ সম্বন্ধে

চিরকাল লোক পরম্পরা বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, ইহাতে ভূতের আশ্রয় আছে। অতএব এই জনরবকে প্রমাণ স্বরূপ মানিয়া ঐ বৃক্ষের উপর ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা!" এই প্রকারের ঐতিহ্য প্রমাণ যদি দয়ানন্দ সাম্প্রদায়িকরা স্বীকার করেন, তাহা হইলে মূর্ত্তি পূজায় কি সন্দেহ রহিল? ইহাতে আবহমান কাল সমস্ত পৃথিবী সাক্ষী রহিয়াছে। এইরূপে সম্ভব ও অর্থাপত্তি দ্বারা ও ইহা স্পষ্ট প্রমাণীত হয়। কিন্তু শ্রোতৃগণ অধীর ও বিরক্ত হইবেন ভয়ে ইহার আলোচনা এখানে বন্ধ করিতেছি। পরন্তু কেহ জিজ্ঞাসিলে অবশ্যই সবিস্তার বলিতে হইবে।

এখন একবার শব্দ প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। এই প্রমাণ সকল প্রমাণের শ্রেষ্ঠ। যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণের খুব প্রতিপত্তি দেখা যায়, কারণ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; তথাপি একদিকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিষয়ক সামগ্রী রহিয়াছে এবং ভিন্ন বিষয়ক শব্দ জ্ঞানের সামগ্রী রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান বিষয় বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা বাদ করিয়া শব্দ বোধ হইতে থাকিবে। এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি নিচয় আপনা আপনি সেই দিকে আকৃষ্ট হইবে।

মনে করুন, আপনি কোন এক অপূর্ব্ব উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছেন এবং কোন সুন্দর কৃত্রিম ফোহারা দেখিতেছেন—কোন দিক হইতে জল আসিতেছে,—কেমন করিয়া উঠিতেছে, কত সুন্দর ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে; এবং এ বিষয়ে অনুমানও করিতেছেন। ইতি মধ্যে যদি কেহ দৌড়িয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "পালাও, পালাও, পিঁজরে হইতে বাঘ ছুটীয়াছে!" বশ, ইহা শুনিবামাত্র নিজের প্রত্যক্ষ অনুমান ধরেই রহিবে কিন্তু এ শব্দের অধীন হইয়া আপনাকে মগ্ন মুগ্ধের ন্যায় চমকিয়া উঠিতে হইবে। শব্দের প্রমাণ এতই গুরুতর।

ইহা শব্দেরই মাহাত্ম্য যে তাহার ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া বৈদ্যেরা স্বীয় প্রেমপাত্রকেও বিষ ভক্ষণ করাইতেছে এবং পিতামাতা ও আপনাদের স্নেহপুত্তলি সন্তানের গাত্রেও ডাক্তারের অস্ত্র চালাইতে দিতেছে। যতরূপ মত প্রচলিত আছে তাহা কোন না কোন শব্দ লইয়াই চলিয়াছে।

প্রমাণস্বরূপ শব্দের লক্ষণ আচার্য্যেরা বলিয়াছেন "আপ্ত বাক্যং শব্দঃ। ইহার অর্থ কেহ বলেন "আপ্ত বাক্যং" অর্থাৎ নির্দ্দোষ বাক্য অপর কেহ বলেন "আপ্তং বাক্যম্" অর্থাৎ যথার্থবাদীদের বাক্য। এতদ্‌সম্বন্ধে নানা

অবচ্ছেদকতা, প্রকারতা ও নিবেশ প্রবেশ শুনিতে হয়ত সেই শাস্ত্রীয়দের সমীপে যাইবেন। যাহারা পরিধেয় বাস কিরূপে পরিধান করিতে হইবে, তাহা রীতিপূর্ব্বক শেখে নাই এবং পত্রিকা ও ন্যায়ের কূট প্রশ্নের ফাঁকিতে পড়িয়া যাহারা ইহাও বিদিত নহে যে, সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হয় কি দক্ষিণে। পরন্তু এইরূপ অসার কোটী কল্পনাতেই ইহাদের আক্কেল গুড়ুম ও জীবনান্ত হয়। আমার ত পণ্ডিতদিগকে বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ভ্রান্ত ও শ্রোতৃ-গণ যতদূর বুঝিতে পারেন, তাহাই বুঝাইতে হইবে।

এখন ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের উক্তি ও পুরাণাদি গ্রন্থের বচন একবার দেখা যাউক! তাহা নির্দ্দোষ বাক্য স্বরূপ হইয়াই রহিয়াছে। কারণ যোগ্যতাকাঙ্খাদি না হওয়াই বাক্যের দোষ বুঝিতে হইবে, তাহা উহাতে নাই। এবং আপ্ত বাক্যের অন্য অর্থ করিলেও তাহা ঠিক হইবে; যে হেতু যতদিন না কেহ তাঁহাদিগকে মিথ্যাভাষী প্রমাণ করিতে পারে, ততদিন তাঁহাদিগকে সত্যবাদী মানিতেই হইবে। অবশ্য এরূপ কুতর্ক কর্ত্তব্য নহে যে, যত দিন সত্যবাদিতা সিদ্ধ না হয়, ততদিন আমি মিথ্যা-বাদীই বলিব। যে হেতু শব্দপ্রামাণ্য বিষয়ে ইহা সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত 'যে মিথ্যাভাষী প্রমাণিত না হইয়াছে, তাহার বাক্য শাব্দবোধজনক। দেখুন, কোন পথিক দূর দেশে যাইতে যাইতে পথ ভুলিয়া গেলে এক বালককেও জিজ্ঞাসা করিয়া লয় 'ভাই, অমুক গ্রামে যাইবার কোন পথ?" এবং বালকের কথায়ই বিশ্বাস করিয়া চলিতে থাকে। চাই সে বালক প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা পথই দেখাইয়া দিউক না কেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত পথি-কের মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ না জন্মিবে ততক্ষণ সে মিথ্যা কথাকেই সত্য মানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র সহস্র উদাহরণ দ্বারা একথা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, যতক্ষণ বক্তার মিথ্যা-বাদিত্বের পরিচয় না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহাকে সত্যভাষীই বুঝিতে হইবে।

প্রত্যুত আমাদিগের আচার্য্য ঋষিদের প্রতি মিথ্যাবাদের বিন্দু মাত্র সন্দেহও আরোপ করা যাইতে পারে না। কারণ, মিথ্যা বাক্য সেই ব্যবহার করিতে পারে যে মূর্খ, উন্মত্ত,বা মিথ্যা উক্তি দ্বারা যাহার কোন স্বার্থ সাধন হয়। কিন্তু কোন্ মূর্খ আমাদের আচার্য্য দিগকে মূর্খ বলিতে সাহসী, যাঁহাদের বিদ্যাবত্তার প্রশংসা বাদে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার লেখনী

নিয়োজিত? কোন্ বদ্ধ পাগলেই বা তাঁহাদিগকে পাগল বলিতে পারে? বুদ্ধিমানেরা ত তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় উন্মত্তবৎ হইয়াছেন।

এখন তাঁহাদিগকে স্বার্থপর বলা বাকী রহিয়াছে। হাঁ, যাহারা নষ্ট, ভ্রষ্ট বা হীন জাতি, তাহারাই কেবল সেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদিগকে স্বার্থ সাধক বলিবে। উহাদের বলিবার ঢংও এই রূপ যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা ব্রাহ্মণ ছিল এবং তাহারা পদে পদে মতলব করিয়াই পক্ষপাতিত্বদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অধিক সম্মান দিয়াছে। এবং প্রতি কথায়ই বলিয়াছে "ব্রাহ্মণের পূজা কর," "ব্রাহ্মণকে বিশ্বাস কর" "ব্রাহ্মণেরই প্রশংসা কর," ইত্যাদি। যাহারা অধম হইয়া পূজনায় ব্রাহ্মণগণকে দ্বেষ করে, তাহারা দগ্ধনেত্রে কি দেখিতে পায় না যে যদি ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থসাধন করাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহারের এত অধিক কড়াকড় নিয়ম কেন হইল? কথায় কথায় ব্রাহ্মণদের প্রধান প্রধান ও কঠিন কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধি, কিন্তু অপরের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্যও সামান্য প্রায়শ্চিত্ত—এ বৈষম্য কেন? ব্রাহ্মণের জীবন ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভিক্ষু আশ্রম পর্য্যন্ত অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় কঠিন। যে ভিক্ষা মাগিবার নাম শুনিলেই লোকের রোমাঞ্চ হয়; যে কথা কাহাকেও বলিলে, 'যা তোর ভিক্ষা মেগে খেতে হবে' সে অভিশাপ মনে করে এবং প্রাণপণে ঝগড়া করিতে দাড়াইবে; যে আপদে ভীত হইয়া লোকে শ্রাদ্ধাদি সময়ে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করে "মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন," সেই ভিক্ষা বৃত্তি যাঁহারা স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপন শিরে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাস্বার্থত্যাগী, ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর, মত-লবী ও পক্ষপাতী!!! আজকালের ব্রাহ্মণেরা যৎ কিঞ্চিৎ অবচ্ছেদকতা প্রকারতা অভ্যাস করিয়া কেবল দক্ষিণার উপর বকধ্যান দিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু চাই সমস্ত ভারত রসাতলে যায়, আর হিন্দু ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহাতে কটাক্ষও নাই। কেবল দক্ষিণা মিলিলেই টিকি নাড়িয়া সকলের আগে আসান লইবে এবং রাজ্ঞঃ পুরুষঃ (তৈলাধারো ভাণ্ডঃ কিংভাণ্ডাধারঃতৈলং) এই সকল কোটী কল্পনার প্রহসন অভিনয় করিতে থাকিবে। এরূপ কলিকালের অব্রাহ্মণদিগকে যাহা কিছু বলুন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু, ইহা নিশ্চিত, আমরা যে আচার্য্য প্রবরদিগের তত্ত্বকথায় মত্ত হই, ও আশ্বাস করি তাঁহারা কখনও এরূপ ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ, যাহারা জন সমাজ পরিত্যাগ

করতঃ অরণ্যে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া কেবল তপশ্চর্য্যা করিয়াও সময় সময় সাধারণকে সদুপদেশ দিয়া জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, তাহাদের কি দায় পড়িয়াছিল যে, অসদুপদেশ দ্বারা জগৎকে প্রতারিত করিবেন? (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে গণপতিকল্প প্রকরণ প্রসিদ্ধ, তাহাতে মূর্ত্তিপূজার বিধান আছে)।

মনুকে শ্রীযুক্ত দয়ানন্দজী অনেক সময় প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, দেখুন তিনিও (৪ অঃ, ১৫২, ১৫৩ শ্লো) লিখিয়াছেন "মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্। পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্বীত দেবতানাংচ পূজনম্॥ দৈবতান্যভিগচ্ছেৎ তু ধার্ম্মিকাংশ্চ দ্বিজোত্তমম্ ঈশ্বরং চৈবরক্ষার্থং গুরূনেবচ পর্বসু॥ ১৫৩॥ এখানে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, পূর্ব্বাহ্ণে শৌচ স্নানাদি ক্রিয়া করিবে এবং মন্দিরে দর্শন করিতে যাইবে। পুনঃ স্বামী, গুরু, মহাত্মাদিগকেও দর্শন করিবে। ইত্যাদিতে মনুর কি মা বাপ মরা দায় পড়িয়াছিল যে, জোর করিয়া উপদেশ বিলাইয়াছেন?

যে দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদা বীণাবাদন করিয়া জগৎ সুধাবৃষ্টিতে প্লাবিত করিয়া বেড়াইতেন, ইহা কিরূপে সম্ভব যে, তিনি বঞ্চকতা পূর্ব্বক নারদ সূত্র ও পঞ্চরাত্রের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন? মহর্ষি শাণ্ডিল্যের কি দায় পড়িয়াছিল যে, ভক্তিসূত্র প্রণয়ন করিয়া জগৎকে ভ্রমজালে আবদ্ধ করিয়াছেন? আমাদের অভিমত ও বিশ্বাস এই, যখন এই প্রধান প্রধান মহাত্মারা সকলেই মূর্ত্তিপূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ইঁহাদের উক্তি অবশ্যই আপ্তবাক্য। এবং এজন্য মূর্ত্তিপূজার শব্দপ্রমাণই প্রবল প্রমাণ।

যদিও আমরা ইহাকেই যথেষ্ট প্রমাণ মনে করিতে পারি, কিন্তু জগতে এমন অনেক সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের ইহাতেও সন্তোষ হয় না। প্রিয় সভাগণ, সন্তোষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়। যখন শ্রদ্ধা বিশ্বাসই নাই, তখন উঁহারা মতাধিকারীও নহে এবং উঁহাদের জন্য আমার এ উদ্যোগও নহে; ইহা পূর্ব্বেই অনেকবার বলা হইয়াছে। কিন্তু, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যাহারা সন্দিহান, কেবল তাহাদের জন্যই আমার এ চেষ্টা ও উদ্যোগ। তাঁহাদের যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে "বেদেত কুত্রাপি মূর্ত্তি ও মন্দিরাদির উল্লেখ দেখিলাম না, উপর উপরের প্রমাণে প্রকৃত সন্তোষ হইতেছে না।" তাঁহাদের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য অধুনা বেদশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে (ছাঁকিতে বাছিতে) প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

[illegible] লিখিত আছে "দেবতা [illegible]

কম্পতে দৈবতপ্রতিমা হসন্তি", ইহা উৎপাত ও শান্তি অধ্যায়। উৎপাতের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবমন্দির কম্পিত হইল এবং দেবমূর্ত্তিরা হাসিয়া উঠিলে উৎপাত হয়। ইহার শান্তি উপায়ও লিখিত আছে। অতএব বেদেও মূর্ত্তি ও দেবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া গেল।

এরূপস্থলে দয়ানন্দীদের দুইটী আপত্তি সাধারণতঃ দেখা যায়। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ভাগ বেদ নহে, দ্বিতীয়তঃ ইহার অন্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। ক্রমশঃ ইহা পরীক্ষা বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে—

(১) বেদের দুই ভাগ। এক মন্ত্রভাগ, অপর ব্রাহ্মণ ভাগ। ভাল জিজ্ঞাসা করি, দায়ানন্দীদের কোন্ যুক্তি অনুসারে ইহার একাংশ বেদ এবং অপরাংশ বেদ নহে? এ বিষয়ে কাশী-নিবাসী রাজা শিবপ্রসাদ ভারতনক্ষত্র এবং দয়ানন্দ সরস্বতীজী এই উভয়ের মধ্যে লিখিত বাদানুবাদ হইয়াছিল। তাহাতে রাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে বরাবর সভ্যতা পরিপূর্ণ, পাণ্ডিত্য পরিচায়ক, দিব্য যুক্তিপূর্ণ পত্র লেখা হইত; কিন্তু তদুত্তরে স্বামীজীর পক্ষ হইতে পাণ্ডিত্য-বিবর্জ্জিত গালাগালিপূর্ণ কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপের চিঠি লেখা হইত। এতদ্‌সম্বন্ধে যাঁহার আনুপূর্ব্বিক জানিবার ইচ্ছা হয়, তিনি রাজাবাবু কর্তৃক প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক গ্রন্থ দেখিবেন। নিশ্চয়ই রাজা শিবপ্রসাদের নিকট দয়ানন্দজীর বাগ্‌রোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ভাগকে বেদ না মানাতে আমাদের দেশের কেন, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশ নিবাসী বিধর্ম্মী পণ্ডিতেরাও ইহাকে এক অসারবাক্যবীর 'ডফোল শঙ্খ, মনে করিয়াছিলেন। রাজা বাবু ২য় নিবেদনে (৪ পৃঃ ৬ পংক্তি) লিখিয়াছেন, ফিরিঙ্গিস্থানের (ইউরোপের) বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ভূষণ কাশীয়া-রাজকীয় পাঠশালাধ্যক্ষ (Principal, Cueen's College, Benares.) ডাক্তার টীবোসাহেব বাহাদুরকে দেখাইয়াছি। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, আমার ত স্বামীজী মহারাজকে খুব পণ্ডিত লোক বলিয়া ধারণাছিল; কিন্তু এখন তাঁহাকে মনুষ্যাধম বলিতেও সন্দেহ হয়।" রাজা বাহাদুর তাঁহার গ্রন্থে টীবো সাহেবের এক পত্রও ছাপিয়া দিয়াছেন। উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে, দয়ানন্দজী দ্বারা রাজা সাহেবের কথার প্রকৃত উত্তর হইতে পারে না।* দেখুন "মন্ত্রে ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ নাম ধেয়ম" ইহা কাত্যায়ন, অশ্বলায়ন

* টীবো সাহেবের পত্র। "The question at issue between Raja Sivaprasad nd Dayanand is the authoritativeness of the several parts of what

আদি মহর্ষিগণ মুক্তকণ্ঠেই বলিতেছেন। "সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ" বলিয়া মহাভাষ্যকার ভগবান্ পাতঞ্জলি বেদের বিস্তার দেখাইয়াছেন। ভগবান্ মনু ২য় অধ্যায়ে "উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা। সর্ব্বথা বর্ত্ততে লোক ইতীয়ং বৈদিকীশ্রুতিঃ।" এ শ্লোকদ্বারা ব্রাহ্মণের ঋচাকে বৈদিকী শ্রুতি

---

is commonly comprised under the name "Veda." Dayanand Sarasvati rejects the Brahmans and Upanishads ( with one exception ) and acknowledges the authority of the Sanhitas only. As this procedure is not in agreement with the religious belief of the Hindus of the present day as well as of the past ages of which we have records, Dayanand Sarasvati is bound to produce convincing proofs for the Validity of the distinction he makes. He mentions that the Sanhitas are 'ঈশ্বরোক্ত,' while the Brahmans and Uupanishads are merely 'জীবোক্ত,' but how does he prove this assertion ? ( for as it stands it can not be called anything but a mere assertion. ) The assertion of the Sanhitas being স্বতঃ প্রমাণ while the Brahmans and Upanishad are merely পরতঃ প্রমাণ can likewise not be admitted before it is supported by arguments stronger than those which Dayanand Sarasvati has brought forward up to the present. Raja Sivaprasad is right to ask "why should not both be স্বতঃ প্রমাণ if one is so ?" or again "why should not both be পরতঃ প্রমাণ if one is so ?" and this reasoning could certainly not be employed by any one for proving that other non-Vedic books are to be considered equal to the Veda ; for the Veda alone ( including Brahmans and Upanishads ) enjoys the privilege of having, since immemorial times, been acknowledged by Hindus as sacred and revealed books.

With regard to the passage quoted by Dayanand Sarasvati from the Satapath Brahmana ( Brihadaranyak Upanishad ) it must be admitted that the objection of Raja Sivaprasad is well founded ; if one part of the passage is authoritative, the ofter part is so likewise. The assertion whether the whole passage is a বাক্য or a বাক্যসমূহ is wholly irrelevant to the point at issue.

Dayanand Sarasvati has certainly no right to declare the passage from Katyayana according to which the Ved consists of Mantra and Brahmana—an interpolation. Acting in this way any body might declare any passage contrary to his preconceived opinions an interpola. tion.

Dayanand Sarasvati rejects the authority of the Brahmans. How then does he prepare to deal with Brahmana portion of the Taittiria Sanhita, which in character nowise differ from other Brahmans like the Satopatha, Panchavinsa &c. And on the other hand does he reject all the mantras contained in the Taittiria Brahmana ?

বলিতেছেন। এইরূপ গৌতম ব্যাসের সূত্রেও অনেক ব্রাহ্মণ বাক্য শ্রুতি বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব কেবল কি দয়ানন্দজীর কথায়ই আমরা ইহার উল্টা বিশ্বাস করিব? এসম্বন্ধে যাহার সবিস্তর জানিবার প্রয়োজন হয়, তিনি বাঁকীপুর খড়্গবিলাস প্রেসে প্রাপ্তব্য "দয়ানন্দ মত মূলোচ্ছেদ" নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

দয়ানন্দজীও এ কথা বেশ জানিতেন; তাই তিনি সত্যার্থ প্রকাশে (৩য় সং, ৬০১ পৃঃ—২ ধারা) লিখিয়াছেন "মন্ত্রভাগ"। এতদ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, ইহাদের মতেও অন্য কোন ভাগ আছে। পক্ষান্তরে স্বয়ং প্রতি কথায় ব্রাহ্মণ ভাগের 'ঋচা' উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অবশ্য তাহাতেও ব্রাহ্মণকে বেদ স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু, মূর্ত্তিপূজার বিরোধ বশতঃ নানাছুতা করিতে হইয়াছিল।

অপিচ দয়ানন্দজী যে রূপে বেদের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহাতেও মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের সমান মর্য্যাদা হয়। সঃ প্রঃ ৭ম উল্লাসে তিনি লিখিয়াছেন "অগ্নের্বাঋগ্বেদোর্জায়তে বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ। শত।"—

প্রথমে সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই ঋষিদিগের আত্মাতে এক এক বেদ প্রকাশ করিলেন। * ইহা মন্ত্র ভাগের কথা যাহা ঈশ্বর ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত করিলেন। এমন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি একবার শ্রবণ করুন। ঐ প্রকরণের কিছু পরেই দয়ানন্দজী স্বীয় শ্রীহস্তে লিখিতেছেন—

"ধর্ম্মাত্মা যোগী মহর্ষিরা যখন যে অর্থ জ্ঞাতুকাম হইয়া ধ্যানাবস্থায় পরমেশ্বরের স্বরূপ চিন্তনে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তখনই পরমাত্মা তাঁহাদিগকে অভীষ্ট মন্ত্রের অর্থ অবগত করাইয়াছেন। ইহাই সেই ব্রাহ্মণ ভাগ। ইহাও ভগবানই ঋষিদের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। বেশ, এখন দায়ানন্দীরা বুঝিয়া দেখিবেন তাঁহাদেরই গুরুজী বেদের উভয়াংশই ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত বলিতেছেন। তবে কি ঈশ্বর ব্রাহ্মণভাগে মিথ্যা উপদেশ দিয়াছেন? অথবা দয়ানন্দ এক মুখে যাঁহাদিগকে ধর্ম্মাত্মা যোগী মহর্ষি বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এখন অধর্ম্মী বলিতে কি দ্বিতীয় মুখ খানা করিবেন এবং বলিবেন যে, উহারা ঈশ্বরের উপদেশ বিরুদ্ধ আপন আপন মন গড়া কথা জগৎকে বঞ্চিত করিবার জন্য লিখিয়া রাখিয়াছে? (জয়ধ্বনি)

(২) দয়ানন্দ ও দায়ানন্দীদের এই চরম চেষ্টা-যখন কোন প্রামাণিক বচন স্বানুকূলে আনিতে পারা যায় না, তাহার উল্টা পাল্টা ও বিকৃত অর্থ করিতে হইবে। অর্থ উল্টা পাল্টা করিতেও ত পাণ্ডিত্যের আবশ্যক। তাহার দুরবস্থা একবার 'অবোধ নিবারণ' নামক পুস্তক দেখিবেন। উহাদের যা কিছু বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য, তাহা কেবল ধূর্ত্ততাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেখুন এ কথায় ও কেমন ধূর্ত্ততার ঝটিকা উড়াইয়াছে।

সং ১৯৪২, আর্য্য গেজেট নামক উর্দ্দূ পত্রিকায় কোন এক ধূর্ত্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি শোক প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে 'লোকে অজ্ঞানতা ও অল্পশিক্ষা বশতঃ এ কথার অর্থ বুঝিতে পারে না।' তাহাদের অর্থটা একবার শুনিয়া লউন। তাহারা বলে "ইহা সায়েন্সের (Science) কথা যখন 'দেবতায়তনানি' অর্থ বেলুন, 'কম্পন্তে' কাঁপিতে থাকে, তখন 'দৈবতপ্রতিমা হসন্তি,' বিদ্বান লোকেরা হাসিতে থাকেন! সেই দিনই ধর্ম্মদিবাকরের পত্র প্রেরক ইহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। আমিও আপনাদিগকে ইহার পূর্ণ প্রকরণ দেখাইতেছি। আপনারা স্বয়ংই বুঝিবেন, ইহা এক ভিন্ন প্রকরণ এবং ইহাতে এক পংক্তির ও অন্য অর্থ করা যাইতে পারে কি না।

প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই লিখিত আছে "অথাতোঽদ্ভুতানাং কর্ম্মণাং শান্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" অদ্ভুত অর্থাৎ অনিষ্টসূচক যে কর্ম্ম তাহার শান্তি ব্যাখ্যা করিতেছি। এতদনন্তর অষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের কর্ম্মোপযোগী মন্ত্রাদি পাওয়া যাইবে। উহার প্রতীক বা আদি পদ মতে লেখা আছে এবং সাধারণ ভাবে শান্তি কর্ম্মের সংক্ষিপ্তসার ইহাতে লিখিত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে "শান্তি-কর্ম্ম-বিদ্যা" যে প্রকারে ব্রহ্মার নিকট হইতে দেবতাগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এবং শান্তি কর্ম্মের প্রারম্ভের কোন কোন নিয়মের বর্ণনা আছে।

তৃতীয় খণ্ডে ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধীয় উৎপাত ও তৎপ্রতীকারার্থ শান্তিকর্ম্মের বিধি লিখিত আছে। যথা—

"সপ্রাচীং দিশমম্বাবর্ত্ততেঽথ যদাস্য মণিমাণিক্য-কুম্ভস্থালীদরণ মায়াসো রাজকুল বিবাদোবা যানচ্ছত্রসয্যাসনাঽবসথ ধ্বজপতকা গৃহৈকদেশ প্রভগ্ননেষু গজবাজি মুখ্যা বা প্রমীযন্ত, ইত্যেবমাদেত্রি-তম্বেতানি সর্ব্বানীন্দ্র দৈবত্যান্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তীন্দ্রায়োত্রা মরুত্বত ইতি স্থাল্রী পাকং হুত্বাপঞ্চভিস্নাজ্যা হুতিভিরভিজুহোতীত্যাদি"

ফলিতার্থ—ঐন্দ্রিক উৎপাত শান্তির নিমিত্ত যখন লোকে হোম করিবে

তখন "সপ্রাচীং দিশ" সে পূর্ব্বমুখ হইবে এবং "অথযদাস্য" যখন বক্ষ্যমাণ উৎপত্তি উপস্থিত হইবে যথা, মহা মূল্য হারাদি মণি অকস্মাৎই অদৃশ্য হইবে, বা মণিকুম্ভস্থালী আদি পাত্র অকস্মাৎ প্রতি গৃহে ফাটিয়া যাইবে অথবা হঠাৎ চিত্তে নানা প্রকার উদ্বিগ্নতা উৎপন্ন হইবে, বা বিনাকারণে রাজকুলের সহিত বিবাদ বাধিবে কিংবা যান ছত্র, শয্যা, সিংহাসন, ধ্বজা, পতাকা বা গৃহ আদির কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যাইবে, বা অকস্মাৎ হাতী, ঘোড়া আদি পশু মরিয়া যাইবে,—এ সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ডই ইন্দ্র দেবতা সম্বন্ধীয় উৎপত্তি বলিয়া কথিত—তখন ইহাদিগকে প্রশমিত করিতে নিম্ন লিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। প্রথমে "ইন্দ্রায়েন্দ্রো মরুত্ব" এই মন্ত্রদ্বারা স্থালীপাকের আহুতি দিয়া পশ্চাৎ এই মন্ত্রদ্বারাই আরও পঞ্চ ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। যথা (১) ইন্দ্রায় স্বাহা, (২) শচী পতয়ে স্বাহা, (৩) বজ্রপাণয়ে স্বাহা, (৪) ঈশ্বরায় স্বাহা, (৫) সর্ব্বপাপশমনায় স্বাহা, ইতি। এই পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া সামগান করিবে। অবিকল এই সকল কথাই ৩য় খণ্ডের বিষয়।

চতুর্থে যাম্য অর্থাৎ যম দেবতা সম্বন্ধীয় উৎপাত ও তাহার শস্তি উপায়। যথা, "সদক্ষিণাং দিশমন্বাবর্ত্ততে যদাস্য প্রজায়া।"

৫ম খণ্ডে "সপ্রতীচীংদিশমন্বাবর্ত্ততেঽথযদাস্য ধান্যেই তয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি," "এতানি বরুণদৈবত্যান্যদ্ভুতানি," লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যখন ধান্যাদি বিষয়ে 'ইতয়ঃ' অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কীট পতঙ্গ বা মুষিকাদি উৎপাত হইবে তাহাকে বারুণ্য উৎপাত কহিবে! এজন্য শান্তি হোম করিবার সময় বরুণের দিক (প্রতীচীংদিশং) অর্থাৎ পশ্চিম মুখ হইয়া করিবে; ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ খণ্ডে, কৌবরের উৎপাতের বর্ণনা এবং তৎশান্তি বিধি লিখিত আছে। "স উদীচীং দিশমন্বাবর্ত্ততে" অর্থাৎ বৈশ্রবণ সম্বন্ধীয় উৎপাত শান্তির নিমিত্ত হোমার্থী পুরুষ উত্তরাস্য হইয়া বসিবে; ইত্যাদি।

৭ম খণ্ডে—ভূকম্প আদি আগ্নেয় উৎপাতের বর্ণনা আছে। এবং তৎপ্রশমনার্থ হোম বিধির ও উল্লেখ আছে—আরম্ভেই এই রূপ "স পৃথিবী মন্বাবর্ত্ততে" অর্থাৎ আগ্নেয় উৎপাতের জন্য হোমার্থী পুরুষ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া হোম করিবে।

৮ম ও ৯ম খণ্ডে যথা ক্রমে বায়বীয় ও সোমদেব সম্বন্ধীয় উৎপাতের

বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। উহার প্রথমে যথাক্রম লিখিত আছে "সোন্তরিক্ষমন্বাবর্ত্ততে" এবং পরে "সদিবমন্বাবর্ত্ততে"। ইহার ভাবার্থ এই যে, বায়ব্য উৎপাতে (অন্তরীক্ষ) আকাশের দিকে মুখ করিয়া এবং সৌম্য উৎপাতে স্বর্গের দিকে (ঊর্দ্ধে) মুখ করিয়া হোম করিবে।

১০ম খণ্ডের আদিতেই লিখিত রহিয়াছে—

স পরাং দিবমন্বাবর্ত্ততে, যদাঽস্যাঽযুক্তানি যানানি প্রবর্ত্তন্তে, দৈবতায়তনানি কম্পন্তে, দৈবতপ্রতিমা হসন্তি, রুদন্তি, নৃত্যন্তি, স্বিদ্যন্ত্যুন্মীলন্তি, নিমীলন্তি, প্রতিয়ান্তি নদ্যঃ, কবন্ধমাদিত্যে দৃশ্যতে, বিজ্বলে চ পরিবিষ্যতে, কেতুপতাকাছত্রবজ্রবিষাণানি প্রজ্বলন্তি অশ্বানাঞ্চ বালধীষঙ্গারাঃ ক্ষরন্তি, অহতানি বর্দ্যাণি কনিক্রন্দন্তে ইত্যেবমাদীনি তান্যেতানি সর্ব্বাণি বিষ্ণুদৈবত্যাদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি, ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইতি স্থালীপাকং হুত্বা পঞ্চভিরাজ্যাহুতিভিরভিজুহোতি বিষ্ণবে স্বাহা ইত্যেবম।"

ইহার তাৎপর্য্য এই "যদাস্য" যখন ইহাকে অযুক্তমান অর্থাৎ (স্বপ্নাবস্থায়) গর্দ্দভ ও মহিষাদি নিন্দিত বাহনে আরূঢ় দেখিবেন বা দেবমন্দির কম্পিত হইবে বা দেবালয়ের বিগ্রহ সকল হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে বা খেলিতে থাকিবে, অথবা তাহাদের ঘর্ম্ম প্রবাহিত হইতে থাকিবে বা তাহারা নয়ন উন্মীলিত ও নিমীলিত করিতে থাকে এবং অকস্মাৎ নদীর জল উজান বহিতে থাকে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই শিরশূন্য কবন্ধের ছায়া দেখা যাইবে, বর্ষা বাদল না হইলেও সূর্য্য এবং চন্দ্র মণ্ডলের চারিদিকে পরিধিরেখা আবির্ভূত হইবে, কেতু, পতাকা, ছত্র, বজ্র, বিষাণ আদি অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিবে, ঘোড়ার পুচ্ছ হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ঝর ঝর করিয়া ছুটিতে থাকিবে, বিনা তাড়নাতেই দুন্দুভি আদি বাদ্য সব বাজিতে থাকিবে—এই সব উৎপাতকে বৈষ্ণব উৎপাত কহে। ইহাদের প্রশমনার্থে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, "ইদং বিষ্ণু" এই মন্ত্র দ্বারা স্থালীপাকের হবন (যজ্ঞ) করিয়া 'বিষ্ণবে স্বাহা' ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চাহুতি দিবে এবং পরে সামবেদীয় মন্ত্র গান করিবে। দেব প্রতিমাদের কম্পনাদি উৎপাত অসময়ে (অনিষ্ট সময়ে) উপস্থিত হয় এ কথা মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বেও লিখিত আছে। "দেবতায়তনস্থাশ্চ নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ।" ভারতযুদ্ধ কালে এই সব উৎপাত ঘটিয়াছিল যথা "দেবতায়তনস্থাশ্চ" অর্থাৎ কৌরবেশ্বরের দেবালয়ে যে সকল দেবতা ছিলেন, তাঁহারা নয়নোন্মীলন আদি ব্যাপার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতি

এখন বিচার করিয়া বলুন, ইহা হইতে কেবল অর্থই সঙ্গত হয়, না মন্দির অর্থ? (জয়ধ্বনি)

যদিও ব্রাহ্মণ ভাগ সম্বন্ধীয় মূর্ত্তিপূজাদ্যোতক এই সব বচনই যথেষ্ট হইত, তথাপি "দ্বিবদ্ধং সুবদ্ধং" (To make the assurance doubly sure) এজন্য আরও দেখাইতেছি যে কালাধিষ্ঠাতৃ দেবের পূজা ইষ্টক আশ্রয়ে কর্ত্তব্য লিখিত আছে।

(১) "এষ বৈ মৃত্যুর্য এষ সংবৎসরঃ এষ হি মর্ত্ত্যানামহোরাত্রাভ্যামায়ুঃ ক্ষিণোতি অথ ম্রিয়ন্তে তস্মাদেষ এব মৃত্যুঃ স যো হৈতং মৃত্যুং সংবৎসরং বেদ ন হাস্যৈষ পুরাজরসোঽহো-রাত্রাভ্যামায়ুঃ ক্ষিণোতি সর্ব্বং হৈবায়ুরেতি" শতং ব্রাং ১০।৩।৩

এষ এবান্তকঃ এষ হি মর্ত্ত্যানামহোরাত্রাভ্যামায়ুষোঽন্তং গচ্ছতি অথ ম্রিয়ন্তে তস্মাদেষ এবান্তকঃ স যো হৈতমন্তকম্ মৃত্যুং সংবৎসরং বেদ ন হাস্যৈষ পুরাজরসোঽহোরাত্রাভ্যা মায়ু-ষোঽন্তং গচ্ছতি সর্ব্বং হৈবায়ুরেতি। ২

(২) স যদগ্নিং চিনুতে। এতমেব তদন্তকং মৃত্যুং সংবৎসরং প্রজাপতিমগ্নিমাপ্নোতি যং দেবা আপ্নুবন্।

(৩) তদ্যাঃ পরিশ্রিতঃ রাত্রিলোকাস্তাঃ রাত্রীণামেব মাপ্তিঃ ক্রিয়তে রাত্রীনাং প্রতিমা তাঃ ষষ্টিশ্চ ত্রীণি শতানি চ ভবতি ষষ্টিশ্চহ বৈ ত্রীণি চ শতানি সংবৎসরস্য রাত্রয়ঃ" ইত্যাদি। শতং ব্রাং ১০।৩।১৩।

(৪) অথ যজুষ্মত্যঃ ইত্যারভ্য যাঃ ষষ্টিশ্চ ত্রীণি চ শতান্যাহলোকাস্তা আহ্নামেব মাপ্তিঃ ক্রিয়তেঽহ্নাং প্রতি মাতাঃ ষষ্টিশ্চ ত্রীণি চ শতানি ভবন্তি, ষষ্টিশ্চ হবৈ ত্রীণি চ শতানি সংবৎ-সরস্যাহানাথ যাঃ ষট্‌ত্রিংশৎ পুরীষং তাসাং ষট্‌বিংশতিস্তো যা শ্চতুর্বিংশতিরর্দ্ধমাসলোকাঃ তাঃ অর্দ্ধমাসানামেব মাপ্তিঃ ক্রিয়তে অর্দ্ধমাসানাং প্রতিমা, অথ যা দ্বাদশমাসলোকাস্তা মাসানামেব মাপ্তিঃ ক্রিয়তে মাসানাং প্রতিমা তা উ দ্বে দ্বে সহর্তু লোকা ঋতুনামশ্নন্য-ন্তায়ৈ। ১৯

(৫) অথ যা লোকম্প্রাণাঃ মুহূর্ত্তলোকাস্তান্মুহূর্ত্ত লোকানামেব মাপ্তিঃ ক্রিয়তে মুহূর্ত্তানাং প্রতিমা তা দশ চ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ শতানি, এতাবন্তো হি সংবৎসরস্য মুহূর্ত্তা ইত্যাদি। শতং ব্রাং ১০।৩।২২০

বাহুল্যভয়ে ইহার ব্যাখ্যা করা হইল না। কিন্তু সুবেরিয়া দেখিবেন যে, উহাতে স্পষ্টরূপে কাল দেবতার পূজা ইটের উপর করিবার বিধি রহি-য়াছে। তাহাতেও প্রথমে বর্ষকে কালস্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে।

যেমন অর্থের প্রতিনিধি শব্দ এবং শব্দের প্রতিনিধি অক্ষর দ্বারা সাং-সারিক ব্যবহার চলিতেছে, সেইরূপ কাল পুরুষের (মৃত্যুর) প্রতিনিধি বর্ষ এবং তাহার প্রতিমা স্বরূপ ইট স্বীকার করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে আবার ৩৬০ খানা ইট বৎসরের ৩৬০ রাত্রির প্রতিমা এবং ৩৬০ খানা ইট বৎসরের ৩৬০ দিনের প্রতিমাস্বরূপ। ২৪ ইট বর্ষীয় ২৪

পক্ষের প্রতিমা এবং ১২ ইট বর্ষের ১২ মাসের প্রতিমা। পুনশ্চ ১০৮০০ খানা ইট বৎসরের (৩৬০ × ৩০ = ১০৮০০) ১০৮০০ মুহূর্ত্তের প্রতিমা স্বরূপ।

প্রিয় মহাশয়গণ! উল্লিখিত অর্থ আমরা স্পষ্টরূপে প্রকরণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু জানি না দায়ানন্দী লোকেরা ইহার অর্থ কি নীলের তেই বুঝিবেন না হোটেলের বিস্কুট গেলাই মনে করিবেন! (জয়ধ্বনি)

বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আরও এক বৈদিক অধ্যায়ের উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহাতে সুবর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনবিধি স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।

"অথ পুষ্করপর্ণমুপদধাতি। যোনির্বৈ পুষ্করপর্ণং যোনিমেবৈতদুপদধাতি। আপো বৈ পুষ্করং, তাসামিদং পর্ণং, যথা বা ইদং পুষ্করপর্ণমপ্স্বধ্যাহিতমেবামিয়মপ্স্বধ্যাহিতা, সেয়ং যোনিরগ্নের্বিয়মাগ্নিরবৈস্যা হি সর্ব্বোঽগ্নিশ্চীয়তে, ইমামেবৈতদুপদধাতি, তামনন্তর্হিতাং সত্যাদুপদধাতি, ইমাং তৎসত্যে প্রতিষ্ঠাপয়তি, তস্মাদিয়ং সত্যে প্রতিষ্ঠিতা, তস্মাদিয়মেব সত্যমিয়ং হ্যেবৈষাং লোকানামদ্ধাতমাম্। ৮

অথ রুক্মমুপদধাতি। অসৌ বা আদিত্য এষ রুক্ম এষ হীমাঃ প্রজা অতিরোচতে রোচো হৈতং রুক্ম ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষং পরোক্ষকামা হি দেবাঃ। অমুমেবৈতদাদিত্যমুপদধাতি, স হিরণ্ময়ো ভবতি পরিমণ্ডল একবিংশতিনির্বাধস্তস্যোক্তো বন্ধুরধস্তান্নির্বাধমুপদধাতি, রশ্ময়ো বা এতস্য নির্বাধা অধস্তাদ্বা এতস্য রশ্ময়ঃ। ১০

"তং পুষ্করপর্ণ উপদধাতি। যোনির্বৈ পুষ্করপর্ণং যোনাবেবৈনমেতৎ প্রতিষ্ঠাপয়তি। ১১

"যদ্বেব পুষ্করপর্ণংউপদধাতি। প্রতিষ্ঠা, বৈ পুষ্করপর্ণমিবং বৈ পুষ্করপর্ণময়ম্ বৈ প্রতিষ্ঠা যো বা, অস্যাম্প্রতিষ্ঠিতোঽপি দূযার নন-প্রতিষ্ঠিত এব স, রশ্মিভির্বা হএতস্যা প্রতিষ্ঠতোঽস্যা মেবৈনমেতৎ প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপযতি। ১২

"অথ পুরুষমুপদধাতি। স প্রজাপতিঃ সোঽগ্নিঃ স যজমানঃ। হিরণ্ময়ো ভবতি জ্যোতি রগ্নিঃ অমৃতং হিরণ্যম্ অমৃতমগ্নিঃ পুরুষো ভবতি, পুরুষো হি প্রজাপতিঃ। ১৫

তং রুক্মউপদধাতি। অসৌ বা আদিত্য এষ রুক্মো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ স এষ-তমেবৈতদুপদধাতি।" ১৭

"অথ সামগায়তি। এতদ্বৈ দেবা এতং পুরুষমুপধায় তমেতাদৃশমেবাঽপশ্যন্ যথৈতৎ শুষ্কং ফলকম্। ২০

তেঽব্রুবন্ উপতজ্জানীত যথাঽস্মিন্ পুরুষে বীর্য্যং দধাম ইতি, তেঽব্রুবংশ্চেতয়ধ্বমিতি, চিতিমিচ্ছতেতি বাব তদ্ অব্রুবন্ বীর্য্যমাদধুঃ তথৈবাস্মিন্নয়মেতদ্ দধাতি।" ইত্যাদি।

"অথ সর্পনামৈরুপতিষ্ঠতে। ইমে বৈ লোকাঃ সর্পা তেহ অনেন সর্পেণ সর্পন্তি, যদিদং কিঞ্চ ইত্যাদি।

ক্রমশ অর্থ বিস্তৃত হইবে। স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবীর প্রতিমূর্ত্তি

স্বরূপ একটী কমলদল স্থাপন করিবে এবং তদুপরি সূর্য্যপ্রতিমা সদৃশ এক সুবর্ণগোলক স্থাপন করিবে। এই প্রতিমাতে সুবর্ণের কিরণ রেখা ও সংযোজনা করিবে। তাহার উপর এক পুরুষাকার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহাকে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে। ততঃপর সামগান করিয়া উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে এবং "নমোঽস্তু সর্পেভ্য" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাহার স্তব করিবে।

বলুন, সহৃদয় শ্রোতৃগণ, মূর্ত্তিপূজার বৈদিক প্রমাণে এখনও কি কোন সন্দেহ আছে? এইরূপ অনুসন্ধান করিলে বেদে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে শত শত ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দারা বিদিত হওয়া যায়, মূর্ত্তিপূজা করিতে বেদ পূর্ণসম্মতি দিতেছেন। অতএব অষ্টম প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর হইল।

(জয় ধ্বনি)

মহাশয়গণ! আমার বক্তৃতার যদি কোথায়ও কোন ভুল চুক হইয়া থাকে, অথবা যদি কোন অংশ কর্কশ ও রূঢ় হইয়া থাকে, যদি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোথায়ও কাহারও প্রতি আক্ষেপ বা কটূক্তি নির্গত হইয়া থাকে, আপনারা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। এখন সকলে একবার প্রেমে গদগদ হইয়া বাহু তুলিয়া মুক্তকণ্ঠে বলুন, জয় শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর জয়।

(জয় ধ্বনি)

বন্ধুগণ! আমাদের এত বয়স অতীত হইয়া গেল, বাকী কয়েক দিন দেখিতে দেখিতে পল পল করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ভীম দৃষ্টি শমন করাল কবল ব্যাদান করিয়া লেলিহান রসনায় শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছে। এ অবস্থায় শুষ্ক কণ্ঠে বাক্ বিতণ্ডায় সময়াতিপাত করা নিষ্ফল। বন্ধুগণ! আসুন, একবার দিন থাকিতে কর যোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া সেই পতিতপাবন দীন দয়ালের নাম কীর্ত্তন করিতে তাঁহারই চরণে শরণ লই। প্রিয়গণ, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যে সলিলের পিপাসায় আকুল হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মৃগতৃষ্ণিকার উত্তপ্ত বালুতে দগ্ধ হইতে থাকে, যদি সলিলের কিছু মাত্রও বোধ শক্তি থাকিত, তাহা হইলে পিপাসুর কাতর নিনাদে নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইত এবং স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আর্ত্তের তৃষ্ণা নিবারণ করিত, কিন্তু সেত জড় পদার্থ—বোধ জ্ঞান রহিত! পক্ষান্তরে, বন্ধুগণ, আমরা যে পরম পদার্থের প্রাপ্তি পিপাসা ব্যাকুল হইয়াছি, যাঁহাকে লাভ করিতে

আমাদের ভারতবাসী সহস্র সহস্র মুনি ঋষি সাধু মহা পুরুষ প্রেমবিহ্বল হইয়া শত রূপে নৃত্য করিয়াছেন, শুনিয়াছি, তিনি পরম দীনদয়াল, দয়ার-সাগর, অধমতারণ ও পতিতপাবন। মিত্রগণ, আসুন, আর উদাসীন থাকিবেন না, তাঁহাকে ডাকুন, তাঁহাকেই ধ্যান করুন। আহা দেখুন, তাঁহার নাম কি মধুর! সে নাম উচ্চারণ করিলে বোধ হয় যেন অমৃত সরোবরে অবগাহন করিতেছি!

প্রস্তাব অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এখন পরিসমাপ্ত করিতে চাই, ভ্রাতৃগণ! একবার বদন ভরে বল 'হরি হরি বোল' (হরি ধ্বনি ও বিশেষ জয় ধ্বনি)॥ ইতি॥

---

# উপসংহার।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য—ধার্ম্মিক ও রসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন, ভাষার যে মাধুর্য্য ও শক্তি আছে, তাহা যে সে ভাষায় অথবা যে সে লেখায় পরিস্ফুট হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্যাসজীর বক্তৃতা স্থলে এরূপ ভিড় ও জমাট হইতেছিল যে, কোথায়ও মক্ষিকার পর্য্যন্ত আওয়াজ শুনা যায় নাই এবং শ্রোতৃমণ্ডলী নির্ব্বাক, রোমাঞ্চ কলেবর, একাগ্রচিত্ত ও চিত্রার্পিতের ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়াছেন। সুতরাং অলীক স্বপ্নের ন্যায় তাঁহাদের নানা সন্দেহ বক্তৃতা শ্রবণে উড়িয়া গিয়াছে। পাঠকগণ যদি এ বক্তৃতা পাঠ করিয়া অবিকল সেইরূপ গুণের পরিচয় না পান, সে জন্য ক্ষমা করিবেন। আজ পর্য্যন্তও আমাদের দেশে সঙ্কেত-লিপি বা দ্রুতলিপি প্রণালীর এতদূর উৎকর্ষ হয় নাই যে, একদিকে বক্তৃতা অজস্র ভাবে প্রদত্ত হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে যেমনটী তেমনটী বক্তৃতা অক্ষরে অক্ষরে লিখিত হইবে। এজন্য কোন বক্তার সম্পূর্ণ ভাষা ও ভাব প্রতি কথায় লিখিয়া দেখান অসম্ভব। বক্তৃতা সময়ে কেবল প্রধান প্রধান ভাব, বিষয় ও যুক্তির অবতারণা স্থূল স্থূল ভাবে লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল; পরে বক্তার বহু সাহায্য লইয়া অনেক স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ স্বরূপ এই বক্তৃতা প্রকাশিত করা যাইতেছে। এজন্য কোন কথা পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও হইতে পারে। ব্যাসজীর শ্রোতৃগণের

দৃষ্টিতে যদি কোন কথা পরিত্যক্ত বা সন্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমি কখনই এ মহাব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না, যদি ছাপরার ধর্ম্মসভা আমাকে উৎসাহিত করিয়া সাহায্য না দিতেন। এনিমিত্ত আমি উক্ত সভার মেম্বরদিগকে, বিশেষতঃ সভার সম্পাদক পরম ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা প্রসাদ এম্, এ, বি, এল, মহাশয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমাদের আর্য্যসমাজী ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণের নিকট মিনতি, তাঁহারা দয়া করিয়া এ পুস্তক খানা একবার পাঠ করিবেন এবং অনুগ্রহ প্রকাশে দোষ গুণ আমাকে জানাইলে পুনঃ সংস্করণে সংশোধন করিতে চেষ্টা পাইব। অধুনা আর্য্যসমাজীদের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপপ্রশ্ন ও তাহার উত্তর এবং দুই একটী ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ লিখিতেছি। ইহার অধিকাংশই শ্রীযুক্ত ব্যাসজীর নানা বক্তৃতাতে শুনিয়াছি। আশা করি, ইহাতে অন্যান্য বক্তাগণেরও আনন্দ হইবে। অপিচ কাশীবাসী বাবু প্রমদা দাস মিত্র মহোদয়ের বক্তৃতা সম্বন্ধে বিলাতের এক সম্মতিসূচক পত্রও এতৎ সম্বলিত প্রকাশিত করা যাইতেছে; যদ্দ্বারা পাঠকগণ বিদিত হইবেন যে, পাশ্চাত্য মতেও (ইউরোপীয়) সকলে মূর্ত্তিপূজা বা প্রতিনিধি পূজার প্রতিপোষক। ইতি—

বিনীত

সাহিত্যাচার্য্য, ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতি উপাধিযুক্ত উক্ত ব্যাস-শিষ্য,

শ্রীগণপতি ত্রিপাঠী।

# ইতিহাস।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পাঠকগণ অবগত আছেন, একদা একলব্য নামে এক ব্যাধকুমার ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষি দ্রোণাচার্য্যের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিল। "প্রভো, আমি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে মানস করিয়াছি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে শিক্ষাপ্রদান করুন।" দ্রোণাচার্য্য উত্তর করিলেন "তুমি নীচ জাতি, অসভ্য ভীল। তোমার এত তীর চালনার কৌশল শিখিয়া কি লাভ? তোমার এই মাত্র প্রয়োজন যে, অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি পাইলে তাহা শিকার করিতে পার এবং তাহাদিগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার। এতদূর বিদ্যা ত তোমার আছেই। এতদতিরিক্ত গভীর বিদ্যার তোমার কি প্রয়োজন? এ বিদ্যা ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত, যাহাদের ধনুক-সাহায্যে রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন করিতে হয়।" একলব্য কতই না অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। অর্জ্জুনাদিরও অনভিমত দেখিয়া বেচারা ভীল ভগ্নমনোরথ হইয়া হেট মুখে প্রস্থান করিল।

কিন্তু, একলব্যের ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিতে এতদূর আগ্রহাতিশয় জন্মিয়াছিল যে, সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ইহাও বেশ ধারণা ছিল যে, গুরু বিনা কোন কার্য্যই সফল হইতে পারে না। অতএব ব্যাধ-কুমার আচার্য্য দ্রোণের এক মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে যথাবিধি তীরচালনা অভ্যাস করিতে লাগিল। আপনা আপনি শাস্তিগ্রহণ করিয়া মৃন্ময় গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া কঠিনতর বাণবিদ্যা শিখিতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যেই সে বাণবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল।

একদিন অর্জ্জুন অরণ্যে বেড়াইতে ২ দেখিলেন, কোন একটী জন্তু (কুকুর) দৌড়াইয়া পালাইতেছে। এবং তাহার মুখ শরাবদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং শব্দ করিতে পারিতেছে না। পার্থ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগি-লেন, এমন ভাবে কে তীর বিদ্ধ করিল যে, অবধ্য পশুও প্রাণে মরে নাই, অথচ শব্দ ও করিতে পারিতেছে না।

অর্জ্জুন এইরূপে চিন্তা করিতে ২ ভ্রমণ করিতেছেন। ইতি মধ্যে দেখিতে পাইলেন। এক ব্যাধতনয় ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিতেছে। অর্জ্জুন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি এই পশুর মুখে বাণবিদ্ধ করিয়াছ?" সে উত্তর করিল,

"ইঁা বড় চীৎকার করিতেছিল, তাই উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছি।" অর্জ্জুন প্রশংসা করিয়া বলিলেন "বেশত তুমি অতি অপূর্ব্ব ও দুরূহ কাজ করিয়াছ।" ভীল বালক বলিল "গুরুর কৃপা হইলে কোন কাজই কঠিন ও দুঃসাধ্য থাকে না।" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন 'তুমি কাহার শিষ্য?' বালক উত্তর দিল "আমি প্রভু দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য।" ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনের অতিশয় ক্রোধ এবং অভিমান হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কি প্রভু দ্রোণাচার্য্য যে বিদ্যা আমাদিগকেও শিক্ষা দেন নাই, তাহা কি দস্যু-তস্কর-ব্যাধকে শিখাইয়াছেন?

তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্য্যের সমীপে যাইয়া অপেক্ষা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, আপনি কি ব্যাধ চণ্ডাল শিষ্যদিগকেও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন? তাহাদিগকে এমন ক্ষিপ্রহস্ততা শিখাইয়াছেন, যাহার নামও আমাদের নিকট কখনও প্রকাশ করেন নাই?"

শ্রবণমাত্র দ্রোণাচার্য্য আরক্তিম লোচনে বলিয়া উঠিলেন "কি! ইহা সর্ব্বথা মিথ্যা। তোমাদের ন্যায় ক্ষত্রিয় কুলভূষণ শিষ্য থাকিতে কি আমি ব্যাধ চণ্ডাল, ভীল দস্যুকে শিষ্য করিতে যাইব?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "বেশ, অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত চলুন, মোকাবেলা করাইয়া দিতেছি।" তদনুসারে অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্য সমভিব্যাহারে একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া মাত্র ব্যাধ তনয় "গুরো" বলিয়া আচার্য্য দ্রোণের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। তাহাতে দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল। তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বল্ মূর্খ, আমি কবে তোকে বাণবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছি? ভীল করযোড়ে বলিল—"প্রভো এ মূর্ত্তিতে আপনি আমাকে তীর চালনা শিক্ষা দেন নাই বটে কিন্তু অন্য মূর্ত্তিতে শিখাইয়াছেন। দয়া করিয়া এদিকে আসুন দেখাইতেছি।"

তখন দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সে এক মৃণ্ময়ী দ্রোণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারই সম্মুখে সযতনে ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করে। ইহা দেখিয়া দ্রোণের ক্রোধ উপশম হইল এবং দ্রোণার্জ্জুন উভয়েই অতি মাত্র বিস্মিত হইলেন।

(দেখুন দ্রোণাচার্য্যের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মৃন্মূর্ত্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আরাধনায় কিরূপ ফল ফলিয়াছিল।)

# "যদি ইহা না পড়িয়া থাক, তবে কিছুই পড় নাই।"

একদা কোন এক বাদশাহ তাঁহার উজীরকে (মন্ত্রী) বলিয়াছিলেন, "আপনাদের হিন্দুরা জানেন যে,আল্লা তালা মাটী বা পাথরের জিনিস নহেন। তথাপি তাঁহার নাম করিয়া পার্থিব পদার্থের পূজা করেন কেন? উহাতে কি তিনি খুসী না নারাজ হইবেন?" উজীর উত্তর করিলেন "জাঁহাপনা, যদি আমাকে ছয় মাস সময় দেন, তবে এ প্রশ্নের উত্তর একবার ভাবিয়া দেখিতে পারি।" বাদসাহ উজীরের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

কিছুদিন পরেই বাদসাহের রাজধানীতে এক বেশ্যা আসিয়া যে পথে বাদশাহ রোজ সন্ধ্যাবেলা হাওয়া খাইতে বাহির হন,—ঠিক সেই রাস্তা পার্শ্বে এক ঘর ভাড়া লইয়া জাক জকমের সহিত ঠাট বাঁধিয়া বসিল। সে বাদসাহ সাহেবের এক প্রকাণ্ড চিত্র প্রস্তুত করাইয়া উচ্চাসনে স্থাপন করিল এবং প্রতিদিন হাত যোড় করিয়া তাহার সম্মুখে বসিত। (কে জানে ইহার মধ্যে উজির সাহেবের কোন কারখানা ছিল কি না!) যখনই বাদসাহ সাহেবের গাড়ী ঐ রাস্তায় বাহির হইত, তখনই তাঁহার চক্ষু দুইটী তাহার ঘরে পড়িত এবং তিনি মনে মনে কৌতুহল বশতঃ চিন্তা করিতেন "আমার ছবিকে ও এত পূজা বন্দনা করে কেন?" বিশেষ খবর লইয়া বাদসাহ জানিতে পারিলেন, সেই বেশ্যা তাঁহার চিত্রের নিকট কখনও ফুলের তোরা, আতরদানির পানের বাটা প্রভৃতি রাখিয়া দিত, কখনও বা হাত যোড় করিয়া ছবির সম্মুখে দাড়াইয়া নানাবিধ স্তুতি মিনতি করিত। ইহা শুনিয়া বাদসাহ সাহেবের মনটা আরও সেই দিকে ঝুকিল, এবং যখনই ঐ দিকে যাইতেন, একবার তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিতেন ও গাড়ীর বেগ কমাইয়া আস্তে আস্তে চালাইতেন। অন্য দিকে যাইবার প্রয়োজন থাকিলেও ঐ দিকে একবার আসিয়া পড়িতেন এবং ছবির সম্মুখে বেশ্যাকে যোড়হাত দেখিয়া মনে মনে ভারি খুসী হইতেন।

অবশেষে একদিন বাদসাহ সাহেব আর থাকিতে না পারিয়া একটী ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ বেশ্যার বাড়ী পৌছিলেন এবং চুপে চুপে তাহার ঘরে

যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই সদাসর্ব্বদা আমার ছবির স্তব স্তুতি করিস, ইহাতে তোর কি অভিপ্রায় আছে?" সে অবনত মস্তকে বাদসাহের পদ চুম্বন করিয়া উত্তর করিল—"জাহাঁপনা, আমার এমন গুণ গরিমা বা রূপ যৌবন নাই, যাহার বলে কখনও হুজুরের চরণ সেবা করিতে অধিকারিনী হইব। সুতরাং কি করি, হুজুরের চিত্র পটের নিকট একবার মনের সাধটা মিটাইয়া লইতেছি।" ইহা শুনিয়া এবং তাহার বিচিত্র প্রীতি দেখিয়া বাদসাহ [illegible] চক্ষের কোণে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "আমি তোর এই [illegible] প্রার্থনায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি; এখন আমার সঙ্গে চল্।"

বাদশাহ সাহেব তাহাকে এক পাল্কিতে চড়াইয়া বেগম খানায় দাখিল করিলেন এবং নিজেই উপযাচক হইয়া চিন্তামগ্ন উজীরকে বলিলেন "আর মূর্ত্তিপূজার জবাবে দরকার নাই"। 'ভক্তির ভগবান' (সাঁচে মনকে মীতা প্রভু)

---

# (যেমন প্রশ্ন তার তেমন উত্তর)

## যেমন কুকুর তেমন মুগুর (Tit for tat)

প্রশ্ন। কি মহাশয়! আপনারা দেখ্‌চি খুব মূর্ত্তিপূজা মূর্ত্তিপূজা ক'রে বেড়াচ্চেন! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনারা যে মূর্ত্তির এত স্তুতি বন্দনা করেন, সেকি তাহা শুনিতে পায়?

উত্তর। বলিহারি, কি মজার প্রশ্ন!! বলি আপনারাত গর্ভিনীর পেটের উপর হাত বুলাইয়া দুই মাসের গর্ভ হইতেই গল্প স্বল্প করেন, জন্ম-মাত্রেই খোকার কাণে মুখ লাগাইয়া ফিস ফিস মন্ত্র আওড়াইতে থাকেন, নামকরণে ছয় মাসের শিশুর সহিতই বাক্যালাপ করেন, মুণ্ডন সময়ে বালকের সহিত এবং নাপিতের উপকরণের সহিত নানা গল্পগুজব উড়াইতে বসেন, আর আমাদের মানা করা হইতেছে!! মূর্ত্তি কিছু না বুঝিলেও পরমাত্মা ত শুনিতে পান? আমরা তাহারই স্তব করি। (এ বিষয়ে জানিতে হইলে দয়ানন্দজী প্রণীত সংস্কার পদ্ধতি দেখিবেন!)

প্রঃ। আপনারা যে মন্ত্রে ফুল চন্দন দিতেছেন, তাহার ত এমন অর্থ নহে যে ফুল চন্দন দেওয়া হয়?

উঃ। যে আজ্ঞে, আমাদের ত পরমাত্মার গুণ কীর্ত্তন করিতে যাওয়া এবং আরাধনা করিতে যাওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য। এমন কি 'নমঃ শিবায়' 'হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি নাম মাত্র দ্বারা পূজা করি। কিন্তু আপনারা ত এই সিদ্ধান্ত ক'রে ব'সে আছেন যে কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার সময় যে মন্ত্র পাঠ করা যাইবে, তাহারও ঐ অর্থ হওয়া চাই। এখন আগে একবার আপন ঘরের কিছু খবর করুন। দেখুন দয়ানন্দ মহর্ষী পুংসবন প্রকরণে লিখিয়াছেন যে, পতি স্বীয় গর্ভিনী স্ত্রীর গর্ভাশয়ে হাত ছুঁয়াইয়া মন্ত্র পড়িবে। একবার চস্‌মা লাগাইয়া দেখুন ত মন্ত্রের কি এই অর্থ যে, তিন মাসের গর্ভের সহিত টাট্টা তামাসা করিতে হইবে বা গর্ভের উপর হাত বুলাইতে হইবে? বাহবে দয়ানন্দীয়! বলি তোমরা আচমনের ত কফ কাশী ধোয়া অর্থ করিয়াছ—গর্ভের উপর হাত বুলানের কি অর্থ করিবে? হাঁ বলিতে পার, এটা ধনের মাত্রা লুকান!

প্রঃ। আপনারা চরণামৃতকে সর্ব্বব্যাধি বিনাশক বলেন। তবে চরণামৃত দ্বারাই সকল রোগের চিকিৎসা করেন না কেন?

উঃ। হ্যাঁ মহাশয়, আমরা ত চরণামৃতকে ব্যাধিবিনাশক বলি; কিন্তু, আপনারা কি গায়ত্রীর দ্বারা রক্ষা করার কথা বলেন না? আপনাদের মতে ত সকলেই গায়ত্রীর অধিকারী, অতএব ডাক্তারদিগকেও গায়ত্রী শিখাইয়া দিবেন যে তাঁহারা রোগীদিগকে ইহা দ্বারাই রক্ষা করিবেন। আর সদাব্রত খুলিয়া দেও, কবচ বিলাইতে আরম্ভ কর, নাবিকেরা ইহা দ্বারা জাহাজ রক্ষা করিবে, সিপাহী পল্টনেরা ইহা দ্বারা শরীর রক্ষা করিবে এবং রাজা রাজ্য রক্ষা করিবেন, আর ভয় কি? বাড়ী পড়ে পড়ে হইলে মেরামত করিয়া কাজ কি? চালের খোলা উড়িয়া গেলে আর ছেয়ে প্রয়োজন কি? গায়ত্রী লইয়া পৌঁছিলেই সব আপদ পালাইবে।

প্রঃ। পরমাত্মা জগদীশ্বরের সামান্য মূর্ত্তি গঠন করিলে তাঁহার অপমান করা হয় না কি?

উঃ। যতক্ষণ অপমানের বা অনাদরের অভিপ্রায় না থাকে, ততক্ষণ কোন কাজই অনাদর বা অপমানজনক বলা যাইতে পারে না। নচেৎ লোক সমাজে কত কাজ মকদ্দমার উপযুক্ত হইয়া যাইত। বলুন আপনার মনোমত নিয়মানুসারেই যদি আদর অনাদর হইত, তাহা হইলে অবশ্যই ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি বানান এবং তাহাও কেবল মাথাটী মাত্র টাকা, পয়সা, ও টিকিটের উপর বসাইয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করা এবং ডাকঘরে তাহার উপর চৈহ্ন কালীর ছাপমারা অতি অনাদরের কাজ! এমত অবস্থায় আপনাদের কখনই ডাক টিকিট কেনা উচিত নহে। এবং আপনাদের বাপ দাদা ও গুরু, মহাগুরুর চিত্র, ফটো বা মূর্ত্তিও রাখা উচিত নহে। *

প্রঃ। পূজা যদি করিতেই হয়, তবে ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি লাগাইয়া সুগন্ধিত কেন করা হয় না? সেই পুরাতন ধূপ চন্দনের কুৎসিত পচা প্রথায় পড়িয়া পচিতেছ কেন?

---

* বাবু প্রমদা দাস মিত্র মহাশয়ের বক্তৃতায় আছে—

If at the sight of a portrait of a beloved and venerated friend, no longer existing in this world, our heart is filled with sentiments of love

and reverence and if we fancy him present in the picture still looking upon us with his wonted tenderness and affection and then indulge our feelings of love and gratitude, should we be charged with offering the grossest insult to him, that of fancying him to be no other than a piece of painted paper? Was cowper all the while insulting and abusing his departed mother, when holding communion with his dear parent visible to his fancy's eye in her picture, he was penning the tenderest of his verses?

"O that those lips had language! Life has pass'd,
With me but roughly since I heard thee last.
Those lips are thine---thy own sweet smile I see,
The same, that oft in childhood solac'd me;
Voice only fails, else, how distinct they say
"Greeve not my child, chase all thy fears away!"
The meek intelligence of those clear eyes
( Blest be the art that can immortalize.
The art that baffles time's gigantic claim
To quench it ) here shines on me still the same.
Faithful remembrancer of one so dear,
O welcome guest, though unexpected here!
And while that face renews my filial grief,
Fancy shall weave a charm for my relief,
Shall steef me in Elysian reverie,
A momentary dream that thou art She." &c &c.

উঃ। আমরা ত বাপু প্রাচীন প্রথার খোলা ময়দানে পড়িয়া আছি। কিন্তু তোমরা ত ইশাই, মুশাই ও কৈশবী মতের সারাংশ লইয়া দয়ানন্দী ধ্বজা উড়াইতে বসিয়াছ, তোমরা কেন সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে ডুম্বর ও অর্জ্জুন বৃক্ষের শলাকা ( সমেত ), কুশা, ও শিমূলের কাঁটায় রমণীর চিকুর ঝড়িয়া লও? তোমরা ত নব্য আলোক পাইয়াছ, তোমাদের জন্য কি হাড় পাকা সময় পড়িয়াছে! তোমরা শূকরের লোমে কুঁচী তৈয়ার করিয়া লওনা কেন!

প্রঃ। ভাল, যদি শিব মূর্ত্তির পূজা কর্ত্তেই হয়, উহাতে প্রতিষ্ঠা আদির শুদ্ধাশুদ্ধি কেন এবং রোহিণী শ্রবণা আদি নক্ষত্র ভেদের এত লটাখটই বা কেন? আকাশের নক্ষত্রের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?

উঃ। তাহা! নব্য তন্ত্রের ইংরাজী বিদ্বানেরা ত ইহা শুনিলেই বিমোহিত হইয়া যাইবেন যে কি চমৎকার প্রশ্ন! কিন্তু আপনার ভিতরে যে এত জিলাপীর পেঁচ, সে বিষয়ে তাঁহারা কি জানেন? আপনারাও যে

অনেক বিষয়ে বিষম গোঁড়ামী প্রকাশ করেন। আপনাদের সীমন্তোন্নয়ন প্রকরণে কেন লেখা হইয়াছে যে "পুংসা নক্ষত্রেণ চন্দ্রমা যুক্তঃ স্যাৎ।" অর্থাৎ চন্দ্রের এমন নক্ষত্রে অবস্থিত হওয়া চাই যাহার নাম পুংলিঙ্গ। শব্দের লিঙ্গও কি আপনাদের কোন কাজে আসে?

প্রঃ। শূদ্র ও স্ত্রীলোক দিগকে শালগ্রাম ছুঁইতে দেন না কেন?

উঃ। আপনারাও একবার নিজেদের সংস্কার বিধিটা উল্টাইয়া দেখুন্‌ত! (৩য় সংস্করণ ২২ পৃঃ)

যজ্ঞাগ্নিতে শূদ্রের ছুঁত মানেন না কেন? কেবল ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গ্রাহ্য অগ্নি বলেন কেন?

প্রঃ॥ সংস্কৃত মন্ত্র প'ড়ে প'ড়ে পূজাকরা হয় কেন? মূর্ত্তি কি কেবল সংস্কৃত মন্ত্রেই বুঝিতে পারে, ভাষা (বাঙ্গালা) বুঝিতে পারে না?

উঃ॥ আমাদের মূর্ত্তিরা সকল ভাষাই বুঝিতে পারেন। অনেক মন্দিরে কেবল ভজন দ্বারাই উপাসনা হয়। কিন্তু, আপনারা যে আচমনীয় সলিল লইয়া সংস্কৃত ঝাড়িতে থাকেন, ইহা আপনাদের কবেকার বিধি?—সংস্কার বিধি ৩য় সং ২১ পৃঃ "অমৃতোপস্তরণমসি" ইত্যাদি। যেমন সুবা রামনারায়ণ সিংহের নাতি ফারসীতে "বেয়ানন্দ এ কিব্র মন দোজহান। কে দয্যা বদস্তস্ত রাহত রসান্"। তর্পণ রচনা করিয়াছে, সেইরূপ আপনারাও ইংরাজী ফারসীতে মন্ত্রের তর্জ্জমা করিয়া পড়িতে থাকুন। কারণ আপনারা ত আর মন্ত্র শক্তিতে আছে নহেন!

প্রঃ॥ সত্যদেবের (সত্যনারায়ণের) পূজায় সওয়া পরিমাণে নৈবেদ্য হয় কেন?

উঃ॥ আপনাদের গামছাই বা ২৪ আঙুলেরই কেন? (সংস্কার বিঃ ৩য় সংস্করণ পৃঃ ২০ দেখুন)

প্রঃ॥ মূর্ত্তিপূজকদের একাদশী আদি দিনের ইতর বিশেষ রহিয়াছে ইহা কেন? দিন সবই সমান।

উঃ॥ আপনারা স্ত্রী সহবাসের জন্য পূর্ণিমা ও অমাবস্যা নিষেধ করেন কেন? সে সময় কি, সকলদিন সমান, একথা মনে থাকে না? (সংস্কার বিঃ ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৩৩, এই প্রকরণে দিনের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ করা হইয়াছে।)

সমাপ্ত।

# বক্তার সংক্ষিপ্তজীবনী।

পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত পশ্চিম ভারতে সুপরিচিত—শিক্ষিত মহলে বঙ্গেও তিনি অজ্ঞাত নহেন। যাঁহার রসময় কবিতামধু আস্বাদন না করিয়াছেন, এরূপ হিন্দী পাঠক বিরল, যাঁহার লেখনী চুম্বন করে নাই, এরূপ হিন্দী পত্রিকা বিরল, যাঁহার অতুলনীয়া বাগ্মিতাপ্রভা উদ্দীপিত করে নাই, পশ্চিম ভারতে এরূপ নগর বিরল, তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক।

সহস্র সহস্র বৎসরের গবেষণা, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা মন্থন করিয়া পুরাতন আর্য্য মহর্ষিগণ যে সমাজ ও ধর্ম্মের অদ্ভুত সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বহু বৎসর মুসলমান অত্যাচারে তাহা জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরাজী ভাব-তরঙ্গে তাহার ভিত্তি বিতাড়িত ও শিথিলিত হইয়াছে। এক সময়ে বঙ্গে কেশবচন্দ্র ও উত্তর পশ্চিমে দয়ানন্দ স্বামী এই হিন্দুগৌরবের শেষ চিহ্ন ও বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি, বাগ্মিতা ও শাস্ত্রজ্ঞান অসংখ্য হিন্দু যুবকের মস্তিষ্কবিকৃতি করিয়া দিয়াছিল। এই দারুণ স্রোতের গতিরোধ করিতে বঙ্গে শশধর প্রভৃতির ন্যায় পশ্চিম ভারতে অম্বিকাদত্তের অভ্যুত্থিতি হইয়াছিল। তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণা ওজস্বিনী বক্তৃতা হিন্দী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ব্রজবুলি, ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষার আবরণে আবৃত হইয়া পঞ্জাব হইতে কলিকাতা, বোম্বাই হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত ভারতের অনেক প্রদেশে বহু নগরে অসংখ্য হিন্দু সন্তানের মতিগতি ফিরাইয়াছে এবং চিত্তশোধন করিয়া তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে আকর্ষণ করিয়াছে।

ইঁহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া পাটনার প্রথম শ্রেণী কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। ছোট বড় হিন্দী সংস্কৃতে প্রায় সত্তর খানা গ্রন্থ ইঁহার লেখনী-প্রসূত হইয়াছে। এমন দিন অদূরবর্ত্তী যখন বিহারী বিহার, সিবরাজ বিজয় ও সামবত নাটকের গ্রন্থকারকে জানিবার জন্য লোকে উদ্গ্রীব হইবে। এমন সময় আসিবে, যখন এই হিন্দী লেখকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনাঙ্ক লইয়া পরবর্ত্তী লেখকেরা বিশাদ আলোচনা করিবেন। অতিসংক্ষেপে এই পুরুষপ্রবরের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইল।

## বংশবৃত্তান্ত।

বীরত্বের লীলাভূমি রাজপুতনার অন্তঃপাতী জয়পুরের সন্নিকটে মানপুর নামক গ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্বৎস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গ্রামের অধিবাসী পণ্ডিত ঈশ্বররাম একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। তাঁহার গৌড় ব্রাহ্মণ বংশ, পরাশর গোত্র, যজুর্বেদ, তিন প্রবর এবং জাহ্নবী সলিলের ন্যায় পবিত্র ভীড়া কুল ছিল। কথিত আছে, ইঁহারা ২।১ শতাব্দী পূর্ব্বে মণ্ডাবা গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে সম বাস করেন। ইঁহার প্রপৌত্র পণ্ডিত হরিজী রামজী রাজাশ্রয় পাইয়া ধূলা নামক গ্রামে অবস্থিতি করেন। কিন্তু তাঁহার আত্মজ পণ্ডিত রাজারাম ধূলার সম্বন্ধ ছিন্ন করিয় জ্ঞাতি পরিজন সহ ৺ বারাণসী ধামে বসতি স্থাপন করিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে ও বিদ্যাগৌরবে কাশীর একজন অতি বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা বলিয়া গণ্য হইলেন। ইঁহার কয়েকটী সন্তানের মধ্যে দুইজন জীবিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত দুর্গাদত্ত, কনিষ্ঠ পণ্ডিত দেবীদত্ত। এই পণ্ডিত দুর্গাদত্ত তিনিই, যিনি হিন্দী-কবি কুলে দত্ত কবি বলিয়া খ্যাতিমান্। যোগ্যপিতার সুযোগ্য সন্তান আমাদের গ্রন্থকার পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস এই কবিকুলের রত্ন দত্ত কবির দ্বিতীয় তনয়।

## জন্ম ও শৈশব।

কবি দুর্গাদত্ত কখনও জয়পুরে, কখনও বা কাশীতে বাস করিতেন। তিনি শক ১৯১৩ অব্দে (১৮৫৬ খৃঃ অঃ) একবার জয়পুর যাইয়া তথায় ৩ তিন বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। এইবার সং ১৯১৫ অব্দে (১৮৫৮ খৃঃ অঃ) চৈত্রমাসে শুক্ল অষ্টমীতে জয়পুর নগরে সিলাবট মহল্লায় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। ইনিই অম্বিকাদত্ত।

১৮৫৯ খৃঃ অঃ, পণ্ডিত দুর্গাদত্ত জ্ঞাতি পরিবার সহ জয়পুর হইতে বারাণসীধামে আগমন করেন। শাস্ত্রানুসারে ৫ম বর্ষ বয়ঃক্রমে অম্বিকাদত্তের হাতে খড়ি হইল। বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অমরকোষ ও রূপাবলী কণ্ঠস্থ হইতে লাগিল। অম্বিকাদত্তের ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতামহী, পিতৃব্য পত্নী প্রভৃতি সকলেই শিক্ষিতা ছিলেন। পিতা একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং শিক্ষিত পরিবারে মেধাবী বালকের শিক্ষা অতি সুন্দর রূপে হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই বালক অম্বিকাদত্ত কয়েক খানা সংস্কৃত কাব্য, অভিধান এবং অনেক হিন্দীশ্লোক মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। পণ্ডিত পিতা মুখে মুখে

অনেক নিত্য ব্যবহার্য্য ও সাধারণ কথার সংস্কৃত নাম শিখাইয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি সংস্কৃতে বাক্যালাপ বেশ বুঝিতে পারিতেন। মস্তিষ্ক পরিচালনা সম্বন্ধীয় ক্রীড়ার প্রতি অম্বিকাদত্তের আশৈশব প্রগাঢ় অনুরাগ। নানাপ্রকার ঐন্দ্রজালিক কৌতুক দেখাইয়া মাতা ভগিনী প্রভৃতিকে চমৎকৃত করা, সতরঞ্চক্রীড়া-নৈপুণ্যে পিতার সমকক্ষ হওয়া তাঁহার বাল্যলীলা ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমান পিতাও দেখিলেন, ঐ ক্রীড়াপরায়ণ পুত্রকে খেলা হইতে নিবৃত্ত করা সুকঠিন। বিশেষতঃ স্বাভাবিক বৃত্তিতে হঠাৎ বাধা প্রদান করিলে অশুভ ফল ফলিতে পারে। সুতরাং সন্তানের ক্রীড়ানুরাগিনী বৃত্তিকে বুদ্ধির খেলায় নিয়োজিত করিয়া যাহাতে চিন্তা শক্তির ও বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হয় তৎপক্ষে যত্নবান্ হইলেন।

৺বারাণসীবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঘনশ্যামজী ইঁহার উপনয়ন করাইলেন।

## বাল্যকবিত্ব ও শিক্ষা।

লেখক ও কবি জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা স্বাভাবিক শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখিতে পাই। আমরা শুনিয়াছি, মহাকবি Shakespeare warbled out his wild note, এবং পোপ lisped in numbers for the numbers came. কেহ বলিতেছেন "Papa, Papa pity take. I'll no more verses make." ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়াছিলেন "রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়েই কলকাতায় আছি।" আমাদের কবি অম্বিকাদত্ত ১০ম বর্ষ বয়সেই হিন্দি ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত শ্লোক ও কবিতা এত সুন্দর হইত যে, অনেকে পড়িয়া মনে করিতেন, বালক শুধু বাহাদুরী লইবার জন্য পিতৃরচিত শ্লোক নিজের বলিয়া পরিচয় দেয়। যখনই অম্বিকাদত্ত রচনা বিষয়ে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া বিমর্ষ হইতেন, তখনই তাঁহার পিতা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়া নিরুৎসাহিত কুমারের ভগ্ন হৃদয়ে উৎসাহ ও আশাবারি সিঞ্চন করিতেন।

"কমলিনি মলিনী করোষি চেতঃ কিমিতি বকৈরবহেলিতানভিজ্ঞৈঃ।
পরিণতমকরন্দমার্মিকাস্তে জগতি ভবন্তু চিরায়ুষো মিলিন্দাঃ।"

অর্থাৎ মূর্খকে অবহেলা করিলে পদ্মিনীর দুঃখিত হওয়া উচিত নহে; ভগবান করুন, তাহার মর্ম্মজ্ঞ ভ্রমর চিরজীবী থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দীকবি হনুমান, দ্বিজকবি মন্নালাল, গোস্বামী দম্পতি-

কিশোর ও পঞ্জাবের মহন্ত নিহাল সিংহ প্রভৃতি অতঃপর খ্যাতনামা মহোদয়গণ এই সময়ে পণ্ডিতদুর্গাদত্তের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। ইঁহাদের সহিত পড়িতে অম্বিকাদত্তের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইত। ইঁহারাও বালক অম্বিকাদত্তের রচিত কবিতার শতমুখে প্রশংসা করিতেন।

১৮৬৯ খৃঃ অঃ গোবপুরের রাজগুরু ওঝা তুলসীদত্তজী কাশী আগমন করেন। তিনি একজন সুকবি ও বীরপুরুষ ছিলেন। সুতরাং কবি ও বলী সমাজে মিশিতে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। কবি তুলসীদত্ত ও পণ্ডিত দুর্গাদত্তের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস আরম্ভ করিলেন।

এই সময় তুলসীদত্তের পরিচিত কবি মহলে এক সমস্যাপূর্ত্তি লইয়া খুব আন্দোলন চলে। অম্বিকাদত্তকেও তিনি ইহা জিজ্ঞাসা করেন। অম্বিকাদত্তের রচিত কবিতা তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সন্দেহ করিলেন, এরূপ সুন্দর ও সরস সমস্যাপূর্ত্তি বালক অম্বিকার বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠে নাই; উহাতে নিশ্চয়ই তাহার পিতা পণ্ডিত দুর্গাদত্তের হাত ছিল। এই সন্দেহ নিরাকরণ মানসে একদিন সেবক কবি, নারায়ণ কবি, হনুমান কবি, দ্বিজ কবি মান্নালাল ও পণ্ডিত দুর্গাদত্ত প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য লোকমণ্ডলী সমক্ষে চতুর কবি তুলসীদত্ত অম্বিকাদত্তকে এক সমস্যা পূরণ করিতে দিলেন। যথা,"মূঁদি গই আঁখৈ তবলাখৈ কৌন কামকী।" অসাধারণ ধীমান্ বালক অম্বিকাদত্ত তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তরে একটী অতি মনোহর কবিতা রচনা করিলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। গুণগ্রাহী ওঝা তুলসীদত্ত দিব্য বস্ত্র সহ প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়া গুণের উপযুক্ত সৎকার করিলেন। সভামধ্যে উপস্থিত কবিতা রচনায় সেই দিন অম্বিকাদত্তের হাতে খড়ি হইল। এই ঘটনা হইতে নবোদিত বাল-কবি অম্বিকাদত্তের যশোভাতি নক্ষত্র গতিতে চারিদিক গুণিসমাজে বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

বাল্যেই অম্বিকাদত্তকে তাঁহার পিতা কথকতা শিক্ষা দেন। অম্বিকা পরিজনবর্গের নিকট কথকতা করিতেন, নিকটে পিতা উপস্থিত থাকিয়া সংক্ষেপ, বিস্তার, সরসতা প্রভৃতি কৌশল বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে অম্বিকাদত্ত বাল্যকালেই ব্রজ ভাষায় অনর্গল বক্তৃতাশক্তি, বাক্‌চাতুর্য্য ও সভায় নির্ভীকতা শিক্ষা করিলেন।

একাদশ বর্ষে পৌছিতে না পৌছিতেই অম্বিকাদত্ত অমরকোষ ও রূপাবলী

সমাপ্ত করিলেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ এবং আরও কতিপয় কাব্য পাঠ করিয়া পণ্ডিত কৃষ্ণদত্তের নিকট লঘুকৌমুদী অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন।

১৮৬৯ খৃঃ অঃ গ্বাল কবির শিষ্য খড়্গ কবি কাশীধামে উপস্থিত হন। তিনি প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি হরিশ্চন্দ্রকে সভামধ্যে এক সমস্যা প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্রের * বিলম্ব দেখিয়া দুর্গাদত্ত বালক অম্বিকাকে সেই সমস্যাপূরণ করিতে বলিলেন। হরিশ্চন্দ্র এবং খড়্গ কবিও তাহা অনুমোদন করিলেন। অম্বিকা অবিলম্বে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সাধুবাদে সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল। সেই দিন হইতে অম্বিকাদত্তের প্রতি হরিশ্চন্দ্রের স্নেহ দৃষ্টি পতিত হইল। এই স্নেহ বন্ধন পরে আরও ঘনীভূত হইয়াছিল।

১৮৭০ খৃঃ অঃ বাবু হরিশ্চন্দ্র 'কবিতাবর্দ্ধিনী' সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রথমবারের আলোচনার সমস্যা ছিল "চিরজীবী রহো বিকটোরিয়া রাণী।" এই সমস্যার অম্বিকাদত্তকৃত পূর্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'কবিবচনসুধা'তে অম্বিকাদত্তের রচিত এই সমস্যা পূর্ত্তি প্রকাশিত করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিলেন,—

"ইস বিলক্ষণ বালক কবিকী বুদ্ধি ভী বিলক্ষণহী হৈ, ঔর অবস্থা ইসকী কেবল বারহ্ বর্ষকী হৈ। হম্ ইসকে ঔর সমাচার ভী লিখৈংগে॥

কং বং সুধাং"

ভাবার্থ,—এই অসাধারণ বালক কবির বুদ্ধিও অসাধারণ। বয়ঃক্রম ইহার দ্বাদশবর্ষ মাত্র। আমরা ইহার বিশেষ বৃত্তান্তও পরে লিখিব।

এইরূপে কৈশোরেই কাব্যজগতে অম্বিকাদত্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যজ্ঞান পাণ্ডিত্য ও কেবল পদ্যরচনে আবদ্ধ ছিল না। শ্রীউদারাজেন্দ্রনাথের মন্দিরে সংস্কৃত নানাস্থানে এই অবস্থাতেই তিনি সুললিত নব্য ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন।

অম্বিকাদত্তের সঙ্গীতানুরাগ দেখিয়া তাঁহার স্নেহপ্রবণ পিতা এক সেতারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গুণধর বালক সেতার বাদ্যেও বিশেষ পটুতা লাভ করিলেন।

শ্রীযুত কাশীরাজের যত্নে বারাণসী ধামে একটী ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় ছাত্রদিগের সংস্কৃত পরীক্ষা গৃহীত হইত। অম্বিকাদত্ত সাহিত্যে

* হরিশ্চন্দ্র কাশীর একজন স্বনামখ্যাত কবি ছিলেন। সমস্যাপূর্ত্তিতেও তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কঠিন অন্ত্যানুপ্রাসের কবিতাতে তাঁহার রুচি ছিল না।

পরীক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার সাহিত্য জ্ঞান দেখিয়া পণ্ডিত বস্তীরাম, পণ্ডিত সখারাম ভট্ট, প্রভৃতি পরীক্ষকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

## সুকবি পদলাভ।

অম্বিকাদত্ত যখন কেবল দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালক, তখনই একঘটনায় তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার এক তৈলঙ্গ বৃদ্ধ শতাবধান * কাশীতে আসিয়া ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে আপনার গুণপনা প্রদর্শন করেন। অনেক ভদ্র উপস্থিত কাশীবাসী কেহ কোনও আশ্চর্য্যশক্তি শতাবধানকে দেখাইলে কাশীর নাম থাকিত, এরূপ ইচ্ছা অনেকেই প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলেন না। পণ্ডিত দুর্গাদত্ত তাঁহার নন্দনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনাদের অভিরুচি হয়ত এই বালক সমস্যাপূরণ কবিতা রচনা করিবে।'

বিষয়ের উল্লেখ করিতে বলিলে হরিশ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর রহস্য করিয়া সম্মুখের 'ঘড়ী' দেখাইয়া ছিলেন। অম্বিকাদত্ত আট আট ঘর বিশিষ্ট ৪টী পংক্তি আঁকিয়া বলিলেন, আপনারা যে যে ঘর দেখাইয়া দিবেন, আমি সেই সেই ঘরে অক্ষর বসাইব। পরে সমস্ত একত্র করিলে শ্লোক প্রস্তুত হইবে।' শতাবধান অক্ষরের ঘর বলিয়া দিতে লাগিলেন, অম্বিকাদত্ত লিখিতে লাগিলেন; পরে এইরূপ শ্লোক রচিত হইল :—

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঘ | টী | সু | বৃ | ত্তা | স্ব | গ | তি |
| দ্বা | দ | শা | ঙ্ক | স | ম | ন্বি | তা |
| উ | ন্নি | দ্রা | স | ত | তং | ভা | তি |
| বৈ | ষ্ণ | বী | ব | বি | ল | ক্ষ | ণা |

"ঘটী সুবৃত্তা স্বগতির্দ্বাদশাঙ্ক সমন্বিতা।
উন্নিদ্রা সততং ভাতি বৈষ্ণবীব বিলক্ষণা॥"

প্রশংসা ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল। কলরবের বিরাম হইলে শতাবধান ঐ বিষয়ে আর একটী শ্লোক রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

* যিনি একই সময়ে শত বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন।

অম্বিকাদত্ত তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্তক্রমে আরও একটী শ্লোক প্রস্তুত করিলেন। তাহা এই,—

"ঘটী ঘটঘটাশব্দব্যাজেন কথয়ত্যুত।
স্বামং রট রট প্রাজ্ঞ কি মনোবিফলৈঃ শ্রমৈঃ ॥"

শতাবধান চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "সুকবিরেষঃ" সভাস্থ পণ্ডিতগণ বালক কবির প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়া সমস্বরে বলিলেন "এ বালক সুকবি পদের যোগ্য বটে, এমন দিন আসিবে, যখন ইহার কবিত্বযশে সংসার পরিপূর্ণ হইবে।" দূরদর্শী পণ্ডিতগণের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। এই ঘটনা অবলম্বনে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র পুলকিত চিত্তে 'কাশী কবিতাবর্দ্ধিনী সভা' হইতে 'সুকবি' উপাধিসহ এক প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়া বালক কবির গৌরব ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

## বিবাহ।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে অম্বিকাদত্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বারাণসী সহরের তিন মাইল দক্ষিণে চিতপুর নামক এক গ্রাম আছে। এই গ্রামের অধিবাসী পণ্ডিত ভবানীশঙ্কর উপাধ্যায় অম্বিকাদত্তের শ্বশুর। ইঁহারাও ২।১ পুরুষ পূর্ব্বে জয়পুরের সান্নিধ্য হইতে এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

অতঃপর পণ্ডিত কুঞ্জলালবাজপেয়ীর নিকট তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। একদা কাশী অধিপতি মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মসভার পারিতোষিক বিতরণ করিতেছিলেন। তিনি অম্বিকাদত্তকে এত অল্পবয়সে পুরস্কার গ্রহণ করিতে দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বালক অম্বিকা কবিতা ছন্দে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। কাশীরাজের সভা পণ্ডিত তারাচরণ ভট্টাচার্য্য দুই একটী প্রশ্ন করিয়া কবিতাকারে উত্তর পাইলেন। ইহাতে উভয়েই অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন, এই বালককে আপনি শিক্ষা দিবেন এবং সময় সময় আমার নিকট লইয়া আসিবেন। ইহার কিছুদিন পরে কাশীর বিখ্যাত জমীদার ঐশ্বর্য্য নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের নিকট কাশীরাজ অম্বিকাদত্তের অশেষ প্রশংসা করেন। এই ঘটনার পর বহু দিন পর্য্যন্ত অম্বিকাদত্ত বারাণসীর রাজদরবারে গতিবিধি করিতেন, এবং সেখানে পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট সাহিত্যদর্পণ ও সিদ্ধান্ত লক্ষণ অধ্যয়ন করিতেন।

এই বৎসর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, কোনও কার্য্যোপলক্ষে অম্বিকাদত্ত পিতার সহিত ডুমরাওন আগমন করেন। ডুমরাওনের মহারাজা রাধিকা প্রসাদ সিংহ ও তাঁহার পারিষদবর্গ এই অপরিণতবয়স্ক পণ্ডিত নন্দনের সমস্যা-পূর্ত্তি, শ্লোক রচনা, ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া পরম পুলকিত হইলেন।

বালক অম্বিকা সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন। সেতার, জলতরঙ্গ, নসতরঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতের চর্চ্চায়ও তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। পরন্তু, পিতার বার্দ্ধক্য বশতঃ সুবৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণের নিমিত্ত তাঁহাকে অর্থ চিন্তায়ও মনোনিবেশ করিতে হইত। এইরূপ বিবিধ বিরুদ্ধ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াও তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা অবিচলিত, প্রশান্ত ও তুল্যরূপ সূক্ষ্মদর্শী ছিল।

## কলেজ প্রবেশ ও উপাধি লাভ।

১৮৭৫ খৃঃ অঃ অম্বিকাদত্ত কাশী গবর্ণমেণ্ট কলেজের এংগ্লো সংস্কৃত বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি কিছু দিনের মধ্যেই ইংরাজীতে কথোপকথন বুঝিতে পারিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগ্নীপতি পণ্ডিত বাসুদেবের নিকট কবিরাজী শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। বারাণসীর তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎ-সক কবিরাজ বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম ইঁহাকে চিকিৎসা বিষয়ের অনেক গুঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। সুধী অম্বিকাদত্ত বঙ্গভাষার প্রতিও অনাদর প্রদর্শন করেন নাই। কলেজে পড়িতে পড়িতেই তিনি হিন্দী ভাষায় লেখনী ধারণ করিলেন। কাশীর 'আর্য্যমিত্র' পত্রিকায় তাঁহার নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এতদ্ভিন্ন প্রস্তার-দীপক, ললিতা-নাটিকা, প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনা এই সময়েই আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অম্বিকাদত্তের অসাধারণ কবিত্বশক্তি বিদ্যালয়ের নিয়মবদ্ধ দৈনিক কার্য্য পরম্পরায় সমাচ্ছন্ন হয় নাই। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কদাচিৎ অপ্রকাশিত থাকিত। সহজজ্ঞানে তাঁহাকে অতিক্রম করা দূরমাস্তাং-তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে, ভারতে এরূপ লোক নখাগ্রে সংখ্যা করা যায়। সমস্যাপূর্ত্তিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুতরাং কলেজ প্রবেশের অতি-অল্পকাল মধ্যেই তিনি শিক্ষক ও ছাত্র সমাজে সুপরিচিত হইলেন।

কলেজে অধ্যয়ন সময়ে পণ্ডিত জানকীপ্রসাদ ওঝার সহিত অম্বিকাদত্তের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। ইঁহারা কবিতা বাঁধিয়া কথোপকথন করা অভ্যাস করিতেন। কখনও কখনও ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কবিতাছন্দে বাদ প্রতিবাদ করিতেন।

মিথিলাধিপের রাজ্যাভিষেক সময়ে রাজাজ্ঞা পাইয়া অম্বিকাদত্ত মহারাজ সম্বন্ধীয় 'সামবত নাটক' সংস্কৃত রচনা করেন।

১৮৭৭ খৃঃ অঃ তিনি এংগ্লো সংস্কৃতের উত্তম বর্গ (Higher standard) পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত কেমসন সাহেব এংগ্লো বিভাগ একেবারে উঠাইয়া দিলেন। এই বৎসরই তিনি কাশ্মীর রাজের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে নাম লিখাইলেন এবং কলেজের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। কলেজের অধ্যক্ষ ভুবন-বিখ্যাত-বিশুদ্ধানন্দ স্বামী পণ্ডিত মণ্ডলী সমক্ষে তাঁহাকে 'ব্যাস' উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

১৮৮০ খৃঃ অঃ বেনারস গবর্ণমেণ্ট কলেজ 'আচার্য্য' পরীক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অম্বিকাদত্ত এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি প্রথমবারই সাহিত্যে পরীক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই বৎসর ১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একা অম্বিকাদত্ত প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া 'সাহিত্যাচার্য্য' পদ লাভ করিলেন। সুতরাং বারাণসী সংস্কৃত কলেজের ইনিই সর্ব্ব প্রথম 'সাহিত্যাচার্য্য'।

## পিতৃমাতৃ বিয়োগ।

১৮৭৪ খৃঃ অঃ অম্বিকাদত্তের স্নেহময়ী জননী পতিপুত্রের মায়াপাশ ছিন্ন-করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৮০ সনে তাঁহার পুত্র-বৎসল পিতাও ৺ কাশীপ্রাপ্ত হইলেন। পিতার অভাবে সংসারের সমগ্রভার ইঁহার স্কন্ধে পড়িল। অসময়ে দুষ্টলোকে চক্রান্ত করিয়া ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল। একেত পিতৃশোক, তাহাতে আবার ঋণভার ও গৃহ বিচ্ছেদ, অপরিণত বয়স্ক 'ব্যাসজী' বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। এইরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াও তিনি সাহিত্যের অতি কঠিনতম পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। এই অসাধারণ ব্রাহ্মণকুমারের অসাধারণ শক্তির শৈশবে সূচনা, যৌবনে উন্মুখ ও প্রৌঢ়ে পরিস্ফুটন হইয়াছে।

## কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ।

সাহিত্যচর্চ্চা, ধর্ম্মপ্রচার, রাজকার্য্য, সম্মান লাভ। কিয়ৎকালান্তর পোর বন্দরের গোস্বামীবল্লভ কুলাবতংস শ্রী ১০৮ জীবনলাল মহারাজের সহিত অম্বিকাদত্ত কলিকাতা আগমন করেন। তিনি তিনমাস কলিকাতাবাস করিয়াছিলেন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভার অধিষ্ঠান হইত। এই সকল সভাতে তিনি সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত

বিবরণ 'সার সুধানিধি,' 'ভারত মিত্র,' 'উচিত বক্তা' প্রভৃতি হিন্দী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস কলিকাতা হইতে কাশীধামে প্রত্যাগত, হইয়া 'বৈষ্ণব পত্রিকা' নামে এক হিন্দী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন।

কবিতা প্রণয়নে পণ্ডিত ব্যাসজী এতদূর নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন যে, তিনি ১ঘণ্টায় অনায়াসে ১০০ শত শ্লোক রচনা করিতে পারেন। এই গুণের পরিচয় পাইয়া কাশী 'ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী' সভার পণ্ডিতগণ ১৮৮১ খৃঃ অঃ তাঁহাকে 'ঘটিকাশতক' উপাধিসহ এক রৌপ্য পদক পুরস্কার দেন।

উদরের চিন্তা, পরিবারের চিন্তা, এবং ঋণের বিষম চিন্তা পণ্ডিতজীকে জর্জ্জরিত করিতেছিল। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছিলেন 'কাতরে কবিতা-কুতঃ।' অম্বিকাদত্ত ও কিছুদিন সাহিত্যচর্চ্চা স্থগিত রাখিয়া অর্থোপার্জ্জনের আশু উপায় অন্বেষণে যত্নবান হইলেন।

১৮৮৩ খৃঃ অঃ বেণারস কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে দ্বারভাঙ্গা জিলায় মধুবাণী সংস্কৃত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

কর্ম্মবীর অম্বিকাদত্তের উদ্ভাবনী বুদ্ধি ও অনলস প্রকৃতি এখানেও অপ্রকাশিত ছিলনা। তিনি ধর্ম্ম, নীতি ও সাহিত্য আলোচনার নিমিত্ত অনেক সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং বিহারে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার মানসে এক অভিনব প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। প্রচলিত প্রথায় অভ্যস্ত মানবের মজ্জাগত সংরক্ষক স্বভাব গড্ডালিকা প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া ভাল মন্দ কোনও রূপ সাদরে গ্রহণ করিতে বিমুখ। সুতরাং অম্বিকাদত্তের বহুমূল্য প্রস্তাবও যদি 'সুবুদ্ধি উড়াইল হেসে', তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? চিন্তাহীনের দন্তবিকাশ ও নাসিকা কুঞ্চন দেখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও উৎসাহহীন বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন না। উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত তিনি দুই বৎসর একটী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পরে বিহারের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মহামতি পোপ সাহেব এই প্রস্তাবের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন! অনেক রাজা মহারাজাও মুক্ত হস্তে পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। সেই সম্মিলিত চেষ্টার ফল বর্ত্তমান 'বিহার সংস্কৃত সঞ্জীবন সমাজ।'

বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত হিন্দী ভাষায় একজন অতি প্রধান বক্তা। বঙ্গে তর্ক চূড়ামণি, বেদান্তবাগীশ, গোস্বামীও পতিত সেন কুমারের

ন্যায় বিহার ও পশ্চিম ভারতে ব্যাসজী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলিয়া সুপরিচিত। ১৮৮৫ খৃঃ অঃ তিনি হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে বাঁকীপুরে আহুত হন। বাকীপুর, ছাপরা প্রভৃতি সহরে তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া বহুসংখ্যক নীতি, চরিত্র ও ধর্ম্মহীন, নিরীশ্বর, উচ্ছৃঙ্খল যুবক পুনরায় সৎপথে আগমন করিয়াছে। নানা কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি মধুবনীর কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু পাটনা স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে মজঃফরপুর জিলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন, ১৮৮৬ খৃঃ।

মজঃফরপুর আসিয়াও তিনি হিন্দুসমাজের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা ত্যাগ করিলেন না। এখানেও সুনীতি ও ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং বিহারের নানা প্রদেশে তাঁহার স্থাপিত সভা সমিতির এক মহাসম্মিলনী হরিহরক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৮৭ খৃঃ অঃ তিনি ভাগলপুর জিলাস্কুলে উন্নীত হইয়া বদলী হইলেন। ভাগলপুরে দয়ানন্দপন্থী আর্য্য সমাজীদিগের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। পণ্ডিত ব্যাসজীও হিন্দুধর্ম্মের অনুকূলে বক্তৃতা আসরে অবতীর্ণ হইলেন। মহা আয়োজনে এক বৃহতী সভার অধিবেশন হইল। পণ্ডিতজীর অমৃতস্যন্দিনী বক্তৃতা ও প্রাঞ্জল শাস্ত্রব্যাখ্যায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিল। এই বিরাট সভায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয় বার্ত্তা চিরস্মরণীয় করিতে ভাগলপুরে যে মহা কর্ণগড়ে বিজয়িনী ধর্ম্মসভা ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে। এই সময়ে তিনি বিহারের অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে আহুত হইয়া তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা ও সারগর্ভ যুক্তিবলে আর্য্য সমাজের ও উচ্ছৃঙ্খলতার গতিরোধ করেন।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে, তিনি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সিংহাসনোরোহণ উপলক্ষে লিখিত সামবত নাটক' মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

এই বৎসর পণ্ডিতজী মৈমনসিং জিলায় রামগোপালপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার যোগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করেন। তথায় ব্যাসজী সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকা প্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ পত্রে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯১ খৃঃঅঃ মহারাজাধিরাজ মিথিলেশ্বরের ব্যয়ে দিল্লী সনাতন ধর্ম্মমহামণ্ডলী হইতে পণ্ডিতজী 'বিহারভূষণ'-উপাধি সহ সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ পণ্ডিতজী তাঁহার সুবিখ্যাত 'বিহারীবিহার' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে অপরিমিত পরিশ্রম করিতেছিলেন। ১৮৯১ অব্দে তাহা সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু কোনও দুরভিসন্ধি ব্যক্তি হস্ত লিখিত পুথি হরণ করিয়া তাঁহাকে দ্বিগুণ পরিশ্রমের অধীন করে। সম্প্রতি এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া হিন্দী ভাষায় এক অমূল্য গ্রন্থ হইয়াছে।

১৮৯৩ অব্দে তিনি বিদায় লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ডুমরা-ওঁয়ে রেওয়াধিপের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ৺ গয়াধামে শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তথায় শ্রীমৎ মাধ্বাচার্য্যের সহিত পরিচয় হয়। তথা হইতে বোম্বাই গমন করেন। সেখানে বল্লভকুল ভূষণ গোস্বামী শ্রী ১০৮ জীবন লালজী মহারাজের সন্দর্শন লাভ করেন। উভয়ে এক সঙ্গে পাটনা আগমন করেন। পাটনা হইতে পুনরায় বারাণসী যাত্রা করেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে কাশীধামে এক মহাসভায় কাঁকরোলী নরেশ গোস্বামী শ্রী ১০৮ বালকৃষ্ণলাল মহারাজ পণ্ডিতজীকে 'ভারতরত্ন' উপাধিসহ সুবর্ণপদক উপহার দিলেন। অতঃপর গোস্বামী জীবনলাল ও আমাদের ভারতরত্ন অম্বিকাদত্ত উভয়ে পঞ্জাব যাত্রা করিলেন।

সাহবাণপুর, লাহোর, অমৃতসর, ডেরাস্মাইল খাঁ প্রভৃতি সহর পরিভ্রমণ করিয়া ডেরা গাঁজী খাঁ আগমন করেন। এখানে ব্যাসজী কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় ২ দুই মাস শয্যাগত ছিলেন। অতি কষ্টে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মুলতান গমন করেন। তথা হইতে শিকারপুর, রোটা, শক্কর, সেবন, আহম্মদপুর, প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া নগর ঠট্টায় উপনীত হইলেন। এইস্থল হইতে বারাণসী প্রত্যাগমন করেন। এইরূপে নগরে নগরে দেশ-বিদেশে হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া, প্রতি স্থানে সভা সমিতিতে ধর্ম্মব্যাখ্যার মধুর গীতি গাহিয়া, মৃতকল্প হিন্দুর জড় প্রাণে তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতাচ্ছটায় নবীন ধর্ম্মলিপ্সা জাগাইয়া পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত অনূ্যন দেড় বৎসর পরে দেশে ফিরিলেন। কর্ম্মবীর আবার ধীরভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এইবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও কার্য্য তালিকা বারাণসীর ভারতজীবন পত্রে আনুপূর্ব্বিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯৫ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ব্যাসজী বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ছাপরা জিলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিত হইয়া বদলী হইলেন। এখানে আসিয়াও

তিনি জীবনের লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নাই। একবার গ্রীষ্মাবকাশে বোম্বাই, হরিদ্বার, জয়পুর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন। এইবারেই ১৮৯৫ খৃঃ অঃ মহারাজাধিরাজ অযোধ্যানরেশ তাঁহাকে 'শতাবধান' উপাধিসহ সুবর্ণ-পদক ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। বোম্বাই নগরে গোস্বামী শ্রী ১০৮ ঘনশ্যামলালজী, মহারাজ এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া ব্যাসজীকে 'ভারত ভূষণ পদসহ সুবর্ণপদকে ভূষিত করেন ( ১৮৯৬ খৃঃ )।

১৮৯৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে পণ্ডিতজী নর্ম্মালস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া বাঁকীপুর গমন করেন। ইহার এক মাস মধ্যেই পাটনা কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সুযোগ্য ডাইরেক্টর, পণ্ডিত ব্যাসজীকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া গুণের উপযুক্ত পুরস্কার ও যোগ্য-তার সম্মান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পাটনা কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

বিগত ৩১শে মার্চ্চ (১৮৯৯) গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে গিধোরের মহারাজা অনরেবল সার রাবণেশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর পণ্ডিতজীকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। তিনি ব্যাসজীর কৃতিত্ব, বিদ্যা, ও ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রস্তাব করিয়াছেন আগামী বিজয়া দশমীর দশহরা মহাসভায় তিনি পণ্ডিত অম্বিকা দত্তকে একটী সুবর্ণপদকে অলঙ্কৃত করিবেন।

গত গ্রীষ্মাবকাশে পূর্ণিয়া জেলার শ্রীনগরের রাজা কমলানন্দ সিংহ বাহা-দুর ব্যাসজীকে আমন্ত্রিত করেন এবং ব্যাসজী রচিত "সুকবি সরোজ বিকাশ" নামক অদ্ভুত সাহিত্যগ্রন্থের সমর্পণ স্বীকৃত করেন তথা পুরস্কার তে অনেক বস্ত্রালঙ্কার সহকারে সুবর্ণপদক এক অতি সুন্দর কিরিচ, এবং এক উত্তম হাতী দিলেন। শ্রীনগরে ব্যাসজীর বক্তৃতা এবং ঘটিকা শতকের শ্লোক গুলি শব্দগ্রাহী যন্ত্র Phonographতে রক্ষিত আছে।

ইহার পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বিদ্যানুরাগ, প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রশংসা এক মুখে কীর্ত্তন করা অসম্ভব। ইনি এতদিন সরকারী কার্য্যে নিরত ব্যাপৃত থাকিয়াও অবসর ক্রমে সভা সমিতিতে হিন্দু ধর্ম্মের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। জীবনের এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় সত্তর খানা হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাসজীর রচিত 'বিহারী বিহার' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থে তাঁহার প্রণীত পুস্তকাবলীর বিস্তৃত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার দ্বিরুক্তি অনাবশ্যক। তিনি

বাঙ্গালা, ইংরাজী, ব্রজভাষা, রাজপূতানী, মিথিলী, প্রাকৃত, উর্দ্দু ও সংস্কৃতে দ্রুত কথোপকথন করিতে পারেন। তাঁহার ন্যায় নানা বিষয়ে মেধাবিশিষ্ট ব্যক্তি দুর্লভ। সঙ্গীত, ক্রীড়া, কৌতুক, ঐন্দ্রজাল, ফটোগ্রাফী ও শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ব্যাসজী সিদ্ধহস্ত। বিহারে ইনিই এক মাত্র পণ্ডিত যিনি বঙ্গে প্রধান প্রধান নিমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হইয়া মহা-মহোপাধ্যায়দিগের অপেক্ষাও অধিক সম্মান পাইয়াছেন।